GIFT

গণকটুলীর হরিজন : অন্ত্যজ মানুষের জীবনকথা

নিবেদনে : ইকরাম নেওয়াজ ফরাজী
এম.ফিল. গবেষক
নিবন্ধন নং : ১৮৭
সেশন : ২০০৯-১০
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

466285

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

DIGITIZED

Dhaka University Library
466285

(এই গবেষণাকর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল. ডিগ্রীর শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে)

তত্ত্বাবধায়নে : শাহীন আহমেদ ১২/২/১৬

শাহীন আহমেদ
অধ্যাপক
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

466285

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা শহরের হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত গণকটুলী হরিজন কলোনিগুলোতে বসবাসরত বংশ পরম্পরায় পেশাজীবী হরিজনদের ওপর করা গবেষণাটি আমার জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

এই গবেষণা সম্পাদনে আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শাহীন আহমেদের প্রতি যিনি আমার এম.ফিল. গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা আমার পক্ষে করা কখনোই সম্ভব হত না।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

466285

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ড. বুরশীদ জাহানের প্রতি যার শুভকামনা, স্নেহ ও মমতা সবসময়ই আমার পাশে থাকে।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গণকটুলী হরিজন কলোনীর বাসিন্দা রাজিব রবিদাস ও সুবল চন্দ্র দাস এবং তাদের পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি যারা আমাকে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে আমি আমার গবেষিত এলাকার সকল মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাদের সহযোগিতার কারণে আমি বলতে পারি, 'সেইসব অসহায় মানুষগুলোর শঙ্খনীল কারাগার দেখে এসেছি।'

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

কৃতজ্ঞতায়,
ইকরাম নেওয়াজ ফরাজী
এম.ফিল. গবেষক
নিবন্ধন নং : ১৮৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ১-২৭

১.১ গবেষণার প্রস্তাবনা

১.২ গবেষণার গুরুত্ব

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষিত এলাকা

১.৫ গবেষিত জনগোষ্ঠী

১.৬ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

১.৬ সাহিত্য পর্যালোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণার পদ্ধতি ২৮-৩৪

২.১ গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

২.২ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

২.৩ প্রাপ্ত চলকসমূহের বিশ্লেষণ

২.৪ গবেষণার সময়সীমা

২.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

তৃতীয় অধ্যায় : হরিজনদের পরিচিতি ৩৫-৪২

৩.১ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপট

৩.২ পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্ট পুরাণে বর্ণিত কাহিনী এবং মনুর বিধান

৩.৩ শ্রমণ সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি

৩.৪ গণকটুলীর হরিজনদের পেশার ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায় : বসতি এলাকা ও পরিবেশ ৪৩-৫৪

৪.১ সমাজে অস্পৃশ্য হরিজনরা

৪.২ ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন

৪.৩ মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে হরিজনরা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : হরিজনদের জীবন ও জীবিকা ৫৫-৬২

৫.১ পৈত্রিক পেশা

৫.২ বিকল্প পেশার সন্ধানে

৫.৩ আয় রোজগার ও ব্যয়

৫.৪ ভাগ্যহীনা এক ভাগ্যলক্ষ্মী রাণী

ষষ্ঠ অধ্যায় : হরিজন নারী ৬৩-৭১

৬.১ মজুরিগত বৈষম্য

৬.২ মাতৃকালীন ছুটির অস্বীকৃতি

৬.৩ প্রজনন স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব

৬.৪ নিরাপত্তাহীনতা

সপ্তম অধ্যায় : মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হরিজনরা ৭২-৭৬

৭.১ শিক্ষাহীনতা

৭.২ চিকিৎসা সমস্যা

৭.৩ ভাষার অবলুপ্তি

৭.৪ মহাজনদের দৌরাত্ম

অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠন ৭৭-৮০

৮.১ ইতিহাস

৮.২ গঠনতন্ত্র

৮.৩ বাংলাদেশ হরিজন ঐক্যপরিষদের দাবীনামা

নবম অধ্যায় : মাঠ কর্মের আনন্দ-বেদনা ৮১-৮২

দশম অধ্যায় : উপসংহার ও সারমর্ম ৮৩-১০৪

সংযোজনী – ১ প্রশ্নমালা

সংযোজনী – ২ গবেষিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ

সংযোজনী – ৩ কেস স্টাডি

সংযোজনী – ৪ সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

সংযোজনী – ৫ প্রাপ্ত ছবি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রস্তাবনা :

বাংলাদেশে অধিকার বঞ্চিত একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাম হরিজন। যারা সমাজে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত ও অবহেলিত। সমাজের কাছে এরা অচ্ছুত বা অস্পৃশ্য। বাংলাদেশে প্রায় ৫৫ লাখেরও বেশি হরিজন বসবাস করেন (তথ্যসূত্র–দলিত বার্তা, ২০০৯) যারা বংশ পরম্পরায় মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। হরিজনদের দলিত বা অন্ত্যজ নামেও ডাকা হয়। দলিত হচ্ছেন তারা, যারা সমাজে নিগৃহীত এবং যারা দলনের শিকার। মূলত, দলিত শব্দটি দিয়ে অনেক সম্প্রদায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীর মানুষকে বোঝানো হয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বর্ণ ও পেশার জনগোষ্ঠী। যেমন : রবিদাস, ঋষি, শব্দকর, বেহারা, বেদে, কাওরা, দাই, হাজাম, শাহজী, ধোপা, ডোম, মুচি, চামার, বাঁশফোর, কুলুসহ আরো অনেকেই।

হরিজনদের বসবাস এদেশের প্রতিটি জেলাতেই আছে। যদিও আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ঢাকা শহরের হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত গণকটুলী সিটি কলোনীর বাসিন্দারা। হরিজনরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। হিন্দুধর্মের সর্বনিম্নস্তরে এদের অবস্থান। এরা বর্ণভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে সমাজে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারছেন না। সব জায়গাতেই হরিজনদের কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে। তাদের পর্যাপ্ত বাসস্থান নেই, ব্যবহারের পানি নেই, নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের ঘর, বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে তাদের চাকুরী থেকে। তাদের সংস্কার-প্রথা-ধর্মীয়বিশ্বাস ইত্যাদি আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

হরিজনদেরকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বা সীমানার মধ্যে কলোনী করে বসবাস করতে হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের বসবাসের ওই নির্দিষ্ট এলাকাগুলোকে বলা হয় হরিজন কলোনী অথবা সুইপার কলোনী। নামে কলোনী হলেও আশেপাশের মানুষেরা বলেন মেথরপট্টি (মেথর বলতে বোঝায় যে মল সাফ করে, ঝাড়ুদার)। এই ব্যবস্থা চলে আসছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি হরিজন কলোনীর অবস্থা একই রকম। হরিজনরা আজীবন অন্যদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত থাকলেও নিজেরা থাকছেন নোংরা পরিবেশে। প্রতিটি পরিবারের তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রজন্ম একসঙ্গে থাকেন। দাদা-দাদি, মা-বাপ আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রতিটি পরিবারেরই নয়-দশ জন সদস্য। নিজেদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলে আধুনিক সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত পরিস্থিতি তারা এখনও তৈরী করে উঠতে পারেননি।

১.২ গবেষণার গুরুত্ব :

হরিজনরা বাংলাদেশের নাগরিক হলেও অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে আসাদুজ্জামান রচিত Pariah People ছাড়া তেমন কোন কাজ হরিজনদের নিয়ে চোখে পড়ে না। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করবার গুরুত্ব যথেষ্ঠ। কেননা তাদের নিয়ে খুব একটা গবেষনা এখনও হয়নি। ঝাড়ুদারি হল হরিজনদের আদি ও জাত পেশা। কিন্তু এখন তারা এই পেশা থেকে ছিটকে পড়ছে। আবার বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলোতে হরিজনদের পরিবর্তে অ-হরিজন সুইপারের (তাদের নিজেদের ভাষায় তারা এই শব্দটিই ব্যবহার করেন) সংখ্যাই বেশি। অধিকার বঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করা আমার কাছে বেশ চ্যালেঞ্জের বিষয় হিসেবেও মনে হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত হরিজনদের জীবনযাত্রা তুলে ধরতে আমার গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তালাল আসাদ ও এডওয়ার্ড সাঈদ পড়ে আমার মনে হয়েছে পশ্চিমা সমাজ যেমন অপশ্চিমা সমাজকে 'অন্য' হিসেবে বিবেচনা করে বন্য, বর্বর, অসভ্য ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছে ঠিক তেমনি সমাজ ও সমাজের কঠোর বিধি বিধানগুলো হরিজনদের মানুষ না, মেথর বলে আখ্যায়িত করেছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য :

হরিজনরা সমাজের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাদের জীবনের একপাশে যেমন রয়েছে বেদনা আর বঞ্চনার ইতিহাস তেমনি অন্যপাশে রয়েছে আধুনিক জীবনের হাতছানি। প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর ওপর কাজ করতে গিয়ে আমার বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে।

ক. এদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

খ. দলিত শ্রেণী হিসেবে কিভাবে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত সেই কারণগুলো অনুধাবন করা। অর্থাৎ কেন তারা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী তা খুঁজে বেরা করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ. সংবিধানের ধারা-২৭ এ বলা আছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। কিন্তু হরিজনরা তারপরও সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য কেন তা খুঁজে বের করা এবং এই জনগোষ্ঠী কিভাবে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

ঘ. হরিজনদের অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সংবেদনশীল করা।

ঙ. সুবিধাবঞ্চিত এসব জনগোষ্ঠীর মর্যাদার উন্নয়নে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

চ. সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা।

ছ. দলিতদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রের ভূমিকার উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা।

জ. ভবিষ্যতে এই গবেষণাকে আরও গভীর ভাবে কাজে লাগিয়ে হরিজনদের সার্বিক উন্নয়নের দিকগুলো তুলে ধরা।

১.৪ গবেষিত এলাকা :

আমার গবেষিত এলাকা হাজারীবাগ। এটি রাজধানী ঢাকার একটি পুরনো এলাকা। গণকটুলী সুইপার কলোনীগুলো এই এলাকায় অবস্থিত। পাকিস্তান আমলে এখানে ৫টি কলোনী তৈরি করা হয়। এই ৫টি কলোনীতেই হিন্দুধর্মের হরিজনরা বসবাস করেন। গণকটুলী সুইপার কলোনীতে ঢোকার বামপাশে যে কলোনীটি সেটিতে মুসলমান সুইপারদের বসবাস। বর্তমানে আবাসন সঙ্কট প্রবল হওয়ায় সরকার নতুনভাবে ৪টি কলোনী তৈরী করেছে। এর মধ্যে ১টি কলোনী হিন্দু হরিজনদের বরাদ্দ দেওয়া হয় যেটি মন্ডপের পশ্চিমে অবস্থিত। বাকি ৩টি কলোনী মুসলমান সুইপারদের বসবাসের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এর উত্তরে রায়েরবাজার, ধানমন্ডি, পূর্বদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণে হাজারীবাগ রোড, পরে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদী অবস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের খুব কাছাকাছি হওয়ায় আমার গবেষিত এলাকায় যাওয়া খুব সুবিধা হয়েছে। বাংলাদেশ লেদার টেকনোলজি কলেজ এই এলাকাতেই অবস্থিত। তাছাড়া বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ১ নম্বর ও ৫ নম্বর গেট সুইপার কলোনীর খুব কাছেই অবস্থিত। সুইপার কলোনী যাওয়ার পথে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সিনেমা হল এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান চোখে পড়ে। ইডেন কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজের আজিমপুর শাখা, আজিমপুর করবস্থান ইত্যাদি এর কাছাকাছি হওয়ায় এই এলাকার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষিত জনগোষ্ঠী :

আমার গবেষিত জনগোষ্ঠী হাজারীবাগ এলাকার গণকটুলী সুইপার কলোনীর হরিজনরা। জাত সুইপার হিসেবে হরিজনরা এদেশে ব্রিটিশ আমল থেকে বসবাস করলেও গণকটুলী সুইপার কলোনীগুলোতে তারা বসবাস করছে পাকিস্তান আমল থেকে। এর আগে হরিজনরা বসবাস করতেন ইডেন কলেজের পাশের ফাঁকা অংশে। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সেই জায়গার পরিবর্তে সরকার পরবর্তীতে তাদের গণকটুলীর বর্তমান কলোনীগুলো বরাদ্দ দেয়। সরকারি নির্দেশে হরিজনরা আবাসস্থল পরিবর্তন করে চলে আসে গণকটুলীতে। মূলত গণকটুলীর বংশ পরম্পরায় পেশাজীবী হরিজনদের জীবন ও জীবিকাকে আমি আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। বাংলাদেশের সব জেলাতেই হরিজনরা আছেন। গণকটুলী সুইপার কলোনীতে বসবাসরত হরিজনরা তার একটি অংশ মাত্র। গবেষিত জনগোষ্ঠীর বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বঞ্চনা, প্রেম, যৌনতা ইত্যাদিকে আমি তুলে আনতে চেষ্টা করেছি।

১.৬ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা :

গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো নির্মাণে বেশ কিছু প্রত্যয় ঘুরে-ফিরে আলোচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতীকবাদ, প্রতিবর্তকবাদ, নারীবাদ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ ইত্যাদি। সেই সঙ্গে চলে আসে এই প্রত্যয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন তাত্ত্বিক এবং তাদের তত্ত্বগুলো। এই তত্ত্বগুলোই 'গণকটুলীর হরিজন : অন্ত্যজ মানুষের জীবনকথা' শিরোনামে গবেষণার মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে।

সমকালীন উত্তর-আধুনিকতাবাদ দুটি তাত্ত্বিক ধারায় বিভক্ত। এর একটিকে প্রভাব বিস্তারকারী উত্তর-আধুনিকাতাবাদীদের গোঁড়া হিসেবে অভিহিত করা হয়, যে ধারার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ফরাসী দার্শনিক দেরিদার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার মতে, অর্থের কাঠামো কখনো সার্বিক ও অবিকলরূপে অনুবাদযোগ্য নয় এবং তা সামাজিক প্রেক্ষিতকে অনুধাবন করতে পারে না। দ্বিতীয় ধারাটি উদার উত্তর আধুনিকতাবাদী ধারা হিসেবে বিবেচিত যা মূলত দেরিদার সমকালীন চিন্তাবিদ বিশেষ করে ফুকোর ভাবনা প্রসূত কর্মের ফল। ফুকো বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্বীয় ঐতিহ্যের একজন পুরোধা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যে অনেক সমাজের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য গোচরীভূত হলেও প্রতিটি ডিসকোর্স নিজস্ব গুণাবলী সম্বলিত।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের আলোচনায় প্রথমেই প্রতিবর্তকবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন বা সমাজ পরিবর্তনের নামে পশ্চিমা তত্ত্বের প্রয়োগের ওপর উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের সন্দেহ বিদ্যমান। সামাজিক গবেষণার কৌশল হিসেবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীগণ গবেষিত সমাজের মানুষের সান্নিধ্যে এসে আন্তঃক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার ওপর বিশেষ জোর আরোপ করেন। একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে নৃবিজ্ঞানীর বা গবেষকের অবস্থান গ্রহণ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা ছিল যা উত্তরাধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণাত্মক অর্ন্তদৃষ্টি গ্রহণ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ধরনের অবস্থান গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রে সার্বিক মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা রক্ষা প্রায় অসম্ভব। ঐ কৌশল প্রয়োগে মূলত পশ্চিমা পুরুষ নৃবিজ্ঞানী অপরিচিত সমাজে পুরুষ দৃষ্টিকোণকে ধারণ করেন। এটাও সত্যি যে, নৃবিজ্ঞানীরা তাদের সাংস্কৃতিক প্রাক-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানসিকতা নিয়েই গবেষণাক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেন। নৃবিজ্ঞানীদের বেলায় যেকোন মাঠকর্মের পূর্বেই এরূপ অতীতমূখিতা ও প্রাক অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে সক্রিয়ভাবে কার্যকর থাকে। কোন ঘটনা বা ঘটনা প্রবাহকে অনুধাবনের প্রশ্নে বহুবিধ বিশ্লেষণাত্মক অনুসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাটি অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। এ ধরনের মূল্যবোধ আরোপিত ভাবনা ভিনদেশীয় সমাজপটে ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুত নৃবৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বনে Inter subjectivity প্রবণতাকে পরিহার করা দুঃসাধ্য। তাই এমন ধারণা করার কোন যৌক্তিকতা নেই যে, কেবলমাত্র পশ্চিমা গবেষকরাই মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা রক্ষায় বিশেষভাবে পারদর্শী।

নৃবিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণার ভিন্নতার কারণে প্রতিবর্তকবাদ ও অতীতমুখীতা এ উভয়টিকে সচেতনভাবে অর্থবহ জ্ঞানের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষ অবলম্বন করেন। কোন গবেষণায় নিহিত থাকাকালীন সময়ে যেকোন বিষয় বিশ্লেষণে একদিকে নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভাবনা প্রাধান্য দেয় এবং অন্যদিকে তার উপস্থিতি গবেষিত মানুষের ভাবনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে তাও জানার প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে Layton এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল। 'অধুনা নৃবিজ্ঞানে পদ্ধতিগত এই দৃশ্যকোণ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় নতুন মাত্রার উন্মেষ করেছে। এ তত্ত্বীয় ধারায় প্রভাবিত রচিত এথনোগ্রাফীক ডিসকোর্সে গবেষক উপাত্ত ছাড়াও নিজের অবস্থান, বাক-বিতন্ডা, তথ্যদাতার প্রদত্ত সংগ্রাম, মাঠকর্মে লব্ধ তিক্ত অনুভূতি বিশেষ করে তথ্য দাতার সঙ্গে আন্ত:ক্রিয়া, সংঘাতমুখর ঘটনা এসব কিছুর প্রতিফলন থাকে। অর্থাৎ যাদের নিয়ে গবেষণা পরিচালিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় তারা নিজেরাও ঐ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে Social Drama এর নায়করূপে আন্ত:সাংস্কৃতিক আবহে যুক্ত হয়।'

এক্ষেত্রে পিয়েরে বর্দোর কাজ উল্লেখ করার মত। পিয়েরে বর্দো আলজেরিয়ার Kabyle নামক একটি নাপিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঠকর্ম পরিচালনা করেন। ঐ সমাজ অধ্যায়নে একজন বহি:সমাজের সদস্য হিসেবে ঐ সম্প্রদায়ের জীবনধারার অভ্যন্তরীণ অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন অর্থে বার্তা অনুসন্ধানে ব্যর্থ হন। এ যাবতকালীন নৃবিজ্ঞানীদের প্রত্যয়কৃত উপঢৌকন প্রথা, কুলা বিনিময় প্রথা, জ্ঞাতি সম্পর্ক ব্যবস্থা একই বিবেচনায় গবেষিত সমাজসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রতীকের সংকেত পুনর্নির্মাণের ভ্রান্তিজনক চেষ্টা হিসেবে অর্থহীন প্রয়াস বলেই উত্তর-আধুনিকতাবাদী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বহিঃদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বের অবতারণা গবেষিত সমাজের সদস্যদের কাছেও দুর্বোধ্য, অর্থহীন ও অপ্রসাঙ্গিক হিসেবে পরিগণিত। এ বিষয়টিকে Layton কোন ব্যক্তির অপরিচিত ভাষার ব্যাকরণ অনুধাবনের অনুশীলনের অনুরূপ বলে মনে করেন। ভিন্ন একটি ভাষার ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি পদের ব্যবহারে কাল, বচন ও পুরুষভেদ ভিন্নতার ক্ষেত্রে তা রপ্ত করার প্রক্রিয়াটিই কাঠামোবাদের প্রতীক অনুসন্ধানের অনুরূপ। কেননা কোন ব্যক্তি তার মাতৃভাষার ব্যবহারে বর্ণমালা সম্পর্কে অবহিত না হয়েও নির্ভুলভাবে সহজাত বুদ্ধিমত্তায় বচন, কাল ও লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার পরিবর্তনসমূহ অনায়াসে ব্যবহারে সক্ষম; প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। বর্দো এই লোকায়ত জ্ঞানকে Habitas বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, অন্য সমাজ বা সেই সমাজের আচারসমূহকে বিশ্লেষণের পরিবর্তে ঐ সকল সমাজের অভ্যন্তরীণ সুপ্ত অর্থপূর্ণ নিত্যদিনের নিয়মনিষ্ঠতাকে কেবলমাত্র যথাযথ উপলব্ধি করাই নৃবিজ্ঞানীর লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এর অর্থ দাড়ায় এথনোগ্রাফী রচনায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্থলে উপাখ্যান (Text) রচনার ধারার অবলম্বন। আমি আমার গবেষণায় বিষয়টিকে মাথায় রেখেছি এবং হরিজনদের নিত্যদিনের আচার-আচরণ, কাজকর্ম, বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদিকে উপলব্ধি করে তারপরে লিখতে চেয়েছি। আমি চেয়েছি তাদের ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, জীবন-যন্ত্রণা গুলো বুঝতে এবং তাদেও মত করেই তুলে ধরতে।

গবেষণার গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের সময় নিবিড় বর্ণনার বিষয়টি সবসময় মাথায় রেখেছি। আমি চেষ্টা করেছি কোন কিছুর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা না দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে। তাই বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে গিয়াটর্জ এর তত্ত্ব। প্রতীকবাদের প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞানী গিয়াটর্জ এথনোগ্রাফী রচনায় Thick description বা নিবিড় বর্ণনার উল্লেখ করে বলেন, একটি সমাজের নিগূঢ় বর্ণনার মধ্যদিয়ে ঐ

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে ধরে রাখা সম্ভব যা পরবর্তীকালে অন্য গবেষকের লিখনীতেও পুন:যাচাই করার ক্ষেত্রে সহায়ক। অতীতে ম্যালিনস্কি ট্রবিয়ান্ডবাসীদের যে জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন তা কালের পরিক্রমায় অপরিবর্তিত থাকেনি। কাজেই এথনোগ্রাফীকে উপন্যাস বা উপাখ্যান হিসেবে পাঠ করার প্রয়োজন রয়েছে। এবং ঐ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যদিয়েই পাঠক পরিবর্তিত সমাজটির পরিবর্তনশীলতাকে যথাযথভাবে অনুধাবনে সক্ষম।

গিয়ার্টজ নৃবিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে যা বলেন তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

(ক) সাংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা

(খ) নৈতিকতার প্রসঙ্গ

(গ) কোন সমাজ ও সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে কি ধরনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিরাজমান?

(ঘ) সমাজ ও সংস্কৃতিকে কতটুকু বোঝা সম্ভব অর্থাৎ মাত্রাটা কি?

তিনি বলেন, নৃবিজ্ঞানী কোন কিছুর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারে। বিশদ বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন সমাজের ঘটনাকে এবং সেই সাথে মূলত সংস্কৃতিকে একেবারে তুলে ধরার জন্যে। এই কাজটি করতে হবে native point of view থেকে। উল্লেখ্য নৃবিজ্ঞানে প্রচলিত এটিক ও এমিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গিয়ার্টস এমিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিলেন। গিয়ার্টস মনে করেন কোন সমাজে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী সব বুঝে ফেলবেন এমন চিন্তা না করে বরং সেই সমাজের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা উচিৎ। নৃবিজ্ঞান হবে Interpretative Anthropology অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক নৃবিজ্ঞান। Native Point of View বলতে যে সমাজের ওপর গবেষক কাজ করেছেন সেই সমাজের নিজস্ব যে মূল্যায়ন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপস্থাপন করা। গিয়ার্টজ বলেছেন, 'গবেষণাধীন সমাজের দৃষ্টিতে যা তাদের মতো করেই তাদের সংস্কৃতিকে অনুধাবন করতে হবে। নতুবা ব্যাখ্যামূলক নৃবিজ্ঞান এর চরিত্রহানী ঘটবে।'

শুচি-অশুচির বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় মেরী ডগলাসের তত্ত্বটি মাথায় রাখার চেষ্টা করেছি। কারণ মেরী ডগলাসের কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল নোংরা, ময়লা বা অশুচি। প্রত্যয়গত অবস্থান থেকে তিনি কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে লেভি-স্ট্রসের পদ্ধতির সাথে

Dhaka University Institutional Repository

মেরী ডগলাসের ব্যাখ্যা সাদৃশ্যপূর্ণ। মেরী ডগলাসের দূষণবোধ ও নৈতিকতা থেকে সৃষ্ট নৈতিক ভুবনবোধের ব্যাখ্যায় বেরিয়ে এসেছে আদিম ও আধুনিক সমাজের বাস্তবতা। আধুনিক সমাজের বাস্তবতায় শূচি-অশূচির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হরিজন এবং তাদের জীবন।

আদিম সমাজে নোংরাবোধটি একটি সার্বজনীন অর্থবহন করে। নোংরা বলে একটি বস্তুকে বা বিষয়কে নির্দেশ করা হয় তখনই যখন ঐ বিষয়ের স্থান-চ্যুতি ঘটে। আদিম সমাজে নোংরা বোধের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে নৈতিকতা, নৈতিকতা থেকে তৈরি হচ্ছে নৈতিক ভূবন। এ নৈতিক ভুবন গড়ে উঠার মধ্যদিয়ে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে। নোংরা হলে পরম বা ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। নোংরাকে শুদ্ধির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে। আদিম সমাজে নোংরা বোধের বিপরীতে পরম বা ঈশ্বরের বোধ তৈরি হচ্ছে। এজন্য নোংরা হল ম্যাজিক, শামান এসবের মাধ্যমে সর্বজনীন একটি রিচ্যুয়াল এর দ্বারা শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া যা ঐ সমাজে বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে নোংরা বোধের সাথে জড়িত হচ্ছে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আবার দূষণবোধ আধুনিক সমাজে বসবাসরত মানুষের স্বাস্থ্যগতবোধ। দূষণ আজকের পৃথিবীতে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও তা সার্বজনীন নয়। কারণ দূষণবোধের অবস্থান মতাদর্শ। মতাদর্শগত কারণে দূষণ নোংরাবোধের ন্যায় কোন একক এবং সংহত প্রতীক নির্মাণে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলাফলে মতাদর্শগত সমাজে বোধের ভিন্নতা বিদ্যমান। এই বোধগুলোর মাধ্যমে আমরা এক ধরনের শ্রেণীকরণ করছি এবং এই শ্রেণীকরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের মূল্যবোধগুলো তৈরি করছি। এ বোধগুলো সব সমাজের মূল্যে একই অর্থ বহন করে না। এ বোধগুলো যখন প্রতীক তৈরি করে দেয় তখন আর তা নষ্ট করা যায় না। প্রতীক অত্যন্ত শক্তিশালী। এই প্রতীকগুলো তৈরি করছে সংস্কৃতি। আর তাই মেরী ডগলাস বলেছেন, 'সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শ্রেণীকরণের এই বোধগুলোকে অনুধাবন করা।'

আমরা দেখে থাকি যে, হরিজনরা সমাজে ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে। অর্থাৎ তারা সমাজের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সমাজকে ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু তারা নিজেরা থাকছে নোংরা পরিবেশে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় তাই মেরী ডগলাসের তত্ত্ব অবধারিত ভাবে চলে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্তকবাদ আলোচনার পরে প্রাচ্যবাদ নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। সাহিত্য সমালোচক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এডওয়ার্ড ডব্লইউ সাঈদ প্রাচ্যবাদ ধারণার জন্ম দেন। তাঁর রচিত 'ওরিয়েন্টালিজম' প্রচন্ড খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর মতে, ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আওতায় রেখে তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্ব'কে শোষণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের জন্য 'প্রাচ্য', 'তৃতীয়বিশ্ব' এই ধরনের প্রত্যয়গুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ যা পূর্বদেশীয় নয় তাই উন্নত যা পশ্চিমা। সাঈদের মতে, এই ধরনের প্রত্যয় নির্মাণ পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট।

একই সুরে কণ্ঠ মিলিয়েছেন সমকালীন নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ। পশ্চিমা ধর্ম কিভাবে একটি ঐতিহাসিক বর্গহিসেবে আবির্ভূত হল এবং সেটিকে কিভাবে একটি বিশ্বজনীন প্রত্যয় হিসেবে প্রয়োগ করা হল–তালাল আসাদ 'জিনিওলজিস অব রিলিজিয়ন' এ এটি অনুসন্ধান করেন। আসাদ বলেন, 'সেক্যুলারকরণের কাহিনীর একটি অতি পরিচিত অংশ হচ্ছে এটি : খ্রিস্টীয় রিফর্মেশনের পরবর্তীকালে ধর্মের একটি মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়েছে–পূর্বের স্বেচ্ছাচারী ও সামাজিকভাবে অবদমনমূলক ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে প্রাইভেট ও তুলনামূলক নিরীহ একটি প্রতিষ্ঠানে।' আসাদ আরো বলেন, 'নতুনরূপে আবির্ভূত ধর্মকে প্রায়শই আহ্বান করা হয় উদারনৈতিক রাজনীতি ও বিশ্ব-সংসারের প্রতি আধুনিকত্বের দৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে, সেটিকে বৈধ করে তুলতে।' তিনি বলেন, 'এটিই এই ধারণা জন্মদান করে যে, 'রাজনীতিকৃত ধর্ম যুক্তি ও মুক্ত চর্চার প্রতি হুমকিস্বরূপ।'

তালাল আসাদ ও এডওয়ার্ড সাঈদ পড়ে আমার মনে হয়েছে পশ্চিমা সমাজ যেমন অপশ্চিমা সমাজকে 'অন্য' হিসেবে বিবেচনা করে বন্য, বর্বর, অসভ্য ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছে ঠিক তেমনি সমাজ ও সমাজের কর্তৃার বিধি বিধানগুলো হরিজনদের মানুষ না, মেথর বলে আখ্যায়িত করেছে।

'হরিজন নারী' অধ্যায়টি লিখতে গিয়ে 'নারীবাদ' প্রত্যয়টিও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। হরিজন নারীদের মজুরিগত বৈষম্য, মাতৃকালীন ছুটির অস্বীকৃতি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব এবং নিরাপত্তাহীনতার আলোচনায় নারীবাদের বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাবনা উঠে এসেছে। নারীবাদের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবনা হচ্ছে নারী নিপীড়িত। নারী নিপীড়নের অপর দিক হচ্ছে পুরুষ আধিপত্য। নারীবাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন পজিশন থাকা স্বত্ত্বেও সকলে কিছু বিষয়ে একমত হতে হয়। যথা : নারী অধস্তনতা প্রাকৃতিক বা ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়। এটা নি:সন্দেহে সামাজিক ও ঐতিহাসিক। পুরুষ আধিপত্যও তাই : নির্দিষ্ট ক্ষমতা কাঠামোর দ্বারা সৃষ্ট, এবং এর কারণে পুরুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদি ভোগ করে থাকে। নারীবাদীদের মধ্যকার কেন্দ্রীয় বিভাজন নারীর অবস্থার বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে গঠিত।

উদারনৈতিক নারীবাদীদের মতে, ব্যক্তি হিসেবে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন আইনী সংস্কারের উপর। তাঁদের বক্তব্য হল : বলা হয়ে থাকে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, কিন্তু নারীবাদী গবেষণা সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করে কিভাবে পুরুষের ক্ষমতা বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। উদারনৈতিক নারীবাদীরা যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন তা হল : নারী ও পুরুষের মজুরির হার একই হওয়া উচিৎ, চাকুরীর একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিৎ ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক / মার্ক্সবাদী নারীবাদীদের মতে, লিঙ্গীয় বৈষম্য শ্রেণী বৈষম্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত মার্ক্সবাদীদের ধারণা হচ্ছে, ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেললে নারী নিপীড়ন আর থাকবে না। তাঁদের দৃষ্টিতে, ব্যক্তি মালিকানা কেবলমাত্র শ্রেণী শাসন নয়, নারী নিপীড়নেরও কারণ। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, বিত্তহীন শ্রেণী, যাদের কিনা সম্পত্তি নেই, সেই শ্রেণীর নারী পুরুষের সম্পর্কও বৈষম্যপূর্ণ। পুরুষ আধিপত্য ও শ্রেণী আধিপত্যকে আলাদাভাবে বুঝতে হবে, এ দুই আধিপত্য কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা নিরিখ করে দেখতে হবে।

সাম্প্রতিককালে, এই দুই ধরনের নারীবাদ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের / কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদীদের দ্বারা। এরা বর্ণবাদের বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে বিদ্যমান নারীবাদী তত্ত্বে পুরুষ আধিপত্য কেন্দ্রীয়। উদারনৈতিক নারীবাদে শ্রেণী প্রসঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, যা কিনা সমাজতন্ত্রী, নারীবাদীরা করেন। কিন্তু বর্ণ বৈষম্যের প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। সমাজে একাধিক কেন্দ্রিয় বিভাজন উপস্থিত : কেবলমাত্র লিঙ্গীয় ও শ্রেণী বৈষম্য নয়। নরবর্ণ ভিত্তিক বৈষম্য একইভাবে কেন্দ্রীয়। এই বৈষম্যের মুখোমুখি না হলে নারীর মধ্যকার বিভেদ

Dhaka University Institutional Repository

এবং কী ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংহতি রচনা করা সম্ভব–এগুলোর পথ খোঁজা দুরূহ হয়ে পড়বে। (আহমেদ, রেহনুমা; চৌধুরী, মানস; পৃষ্ঠা নং : ৩২, ৩৩; ২০০৩)

এই গবেষণায় দু'জন নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীর তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। হেনরিয়েটা মুর ও রায়না র‍্যাপ। গবেষণা ক্ষেত্রে পুরুষ নৃবিজ্ঞানী কিভাবে নীরবতা পালন করেন তার উল্লেখ করে মুর বলেন, কেনিয়ার Marakwet সম্প্রদায়ের ওপর একজন পুরুষ নৃবিজ্ঞানী গবেষণাকর্মে ঐ সমাজের পুরুষদের অধিক ক্ষমতাধর ও প্রতাপের সম্পর্কে নীরবতা পালন করেন। ঐ সম্প্রদায়ের পুরুষদের আধিপত্যের বিষয়টি অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। সামাজিক প্রেক্ষিতই পুরুষদের অধিক মর্যাদাসীন করে যে কারণে যেকোন ঘটনায় পুরুষরাই মহিলাদের মুখপাত্র হিসেবে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। নারীরা ক্ষেতে খামারে প্রতিনিয়ত শস্য উৎপাদনে শ্রম ব্যয় করলেও জনমহলে পুরুষদেও কর্ম যেমন : গবাদী পশুপালন অধিক স্বীকৃতি পায়। নারীরা যেটুকু কাজ করে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি নারীরা পায় না, তা পুরুষদের দ্বারা স্বীকৃতি পেতে হয়। পুরুষদের অভিন্ন চিন্তাধারা ও বিশ্বাস কার্যত বৈশ্বিক জ্ঞানে রূপ পরিগ্রহ করে। সম্পত্তির মালিকানা পুরুষদের একটি স্বীকৃত অধিকার অন্যদিকে নারীদের অবস্থান দৃশ্যপটের পেছনেই থাকে। এ সাংস্কৃতিক মন্ডলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। যদিও পুরুষদের সম্মুখে নারীরা পুরুষ দৃষ্টিকোণের সমর্থনের কথা বলে। পর্দার অন্তরালে যখন তারা নিজেরা সম্মিলিত হয় একই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। এ কারণে মুর নারীদের Muted Group বা বাকরুদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নারীদের অদৃশ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন; কেনিয়ার ঐ সম্প্রদায়ে বৎসরের কোন এক সময় বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক নারী দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। এ অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র নারীরাই পুরুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় বেশ কিছু দীক্ষামূলক আচারে লিপ্ত হয় এবং আপেক্ষিকভাবে বয়স্ক নারীরা পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের জীবনচক্র বিষয়ক নানান পরামর্শ ও জ্ঞান দান করে। দীর্ঘদিনের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বয়োঃপ্রাপ্ত নারীরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের সমাজে জীবনে পুরুষদের মোকাবেলায় কিভাবে প্রতিবাদী হতে হয় তার বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেন। স্বামীদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও আনুগত্য করার উপদেশও দেয়া হয়। এছাড়া নারীদের যৌন বিষয়ক ক্ষমতাকে পুরুষের বঞ্চনার মধ্যদিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার শক্ত হাতিয়ার ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কেও স্বল্প বয়সী নারীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেওয়া হয়। তাদেরকে এও জানানো হয় কি কি কারণে পুরুষরা ভাবাবেগশ্রিত হয় এবং কোন কৌশলে তাদের সঠিক দাবীটি দুর্বলতার মধ্যেও অর্জন করা

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব। স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করলে কিভাবে সকল গৃহবধূরা একজোট হয়ে ঐ পুরুষের ওপর চড়াও হবে। (চৌধুরী, আহমেদ ফজলে হাসান; পৃষ্ঠা নং : ২২৯; ২০০৩)

শ্রেণী ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের অর্ন্তপ্রবিষ্টতা দেখাতে আরেকজন নৃবিজ্ঞানীর তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি হলেন রায়না র‍্যাপ। তিনি সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী। তাঁর প্রধান বক্তব্য হল : 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণীবিভক্ত; শ্রেণী সত্তা লিঙ্গায়িত অর্থাৎ মানুষের সত্তা পরিচিত এগুলো লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয়।'

র‍্যাপ বলেন, 'শ্রেণী কোন বস্তু নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া, একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া উৎপাদনের উপায়ের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। ব্যক্তির অবস্থার বদল ঘটতে পারে : তার কপাল যেমন খুলতে পারে, তার কপাল পুড়তেও পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি কিংবা তার পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু, যা পরিবর্তিত হয় না তা হচ্ছে, সামগ্রিক বৈষম্যের সম্পর্ক (মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক, ধনী-গরিবের সম্পর্ক)। বৈষম্যের এই ব্যবস্থা অতি গভীর ও কাঠামোগত।'

পরিবারের অর্থ সার্বজনীন নয়। এটি সমাজ ও ইতিহাস নির্দিষ্ট। এই প্রেক্ষিতে র‍্যাপ বলেন যে, 'পরিবার বলতে সার্বিক সমাজের মানুষজন দুটো জিনিস বোঝেন : সংকীর্ণ অর্থে পরিবার হচ্ছে- স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের নিজেদের সন্তান দ্বারা গঠিত একক। ব্যাপক অর্থে পরিবার হচ্ছে রক্ত-সম্পর্কিত জ্ঞাতি। আর গৃহস্থালী কি? মার্কিন সমাজে গৃহস্থালী হচ্ছে বসবাসের একক (একই ছাদের নিচে থাকা, এক সাথে খাওয়া)। গৃহস্থালী হচ্ছে সেই স্থান যেখানে এর সদস্যরা তাদের সম্পদ (আয়, আসবাবপত্র, তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র ইত্যাদি) একত্রীভূত করেন এবং কিছু কার্য সম্পাদন করেন। মানুষজন ও সম্পদ গৃহস্থালীতে বন্টিত হয়, যুক্ত হয়।'

র‍্যাপ আরও বলেন, 'পরিবার হচ্ছে মতাদর্শ।' মতাদর্শ বলতে বোঝায় ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যা নির্দিষ্ট সামাজিক দল কিংবা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। মতাদর্শ আধিপত্যশীল শ্রেণীর স্বার্থ, জীবন-যাপনকে বৈধতা দান করে। অর্থাৎ মতাদর্শ ক্ষমতা ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। র‍্যাপ পরিবারকে মতাদর্শ বলেছেন তার কারণ, পরিবারের ধারণা একই সাথে বস্তুগত সম্পর্ককে প্রকাশ করে (ও

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরী করলে বাচ্চাদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে, আমি মানা করে দিয়েছি')। আবার এই সম্পর্কগুলোকে আড়াল করে। ('আরে ভাই বুঝলেন, আমার স্ত্রী হচ্ছে হোম- মিনিস্টার! ওর কথা মত আমার চলতে হয়')।

শ্রমিক শ্রেণীর একটি মাত্র সম্পদ আছে। তা হচ্ছে শ্রম-ক্ষমতা। শ্রম বিক্রি করে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজন খাওয়া-পরা-থাকার ন্যূনতম চাহিদা মেটান। কাজের বিনিময়ে একজন শ্রমিক পান মজুরি এবং এই মজুরি হচ্ছে গৃহস্থালীর অর্থনৈতিক ভিত্তি। একটি গৃহস্থালীর ক'জনকে আয় করার কাজে পাঠানো হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি জিনিসের উপর : গৃহস্থালী টিকিয়ে রাখার ন্যূনতম খরচপাতির উপর, প্রতিটি সদস্যের শ্রম-ক্ষমতা এবং গৃহীচক্রের উপর। শ্রমিকদের নিত্যদিনের খাওয়া-পরা-থাকার চাহিদা মেটানো হয় গৃহস্থালী নামক স্থানে। এই স্থান আবার ভবিষ্যতের শ্রমিকও উৎপাদন করে। এ দুটো কার্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ শ্রম-ক্ষমতার পণ্যকরণ হচ্ছে পুঁজিবাদের আবশ্যিক শর্ত। পুঁজিবাদী সমাজে আর অন্যান্য পণ্যের মতন চাল, ডাল, গাড়ি, টেবিল, পোশাক, কম্পিউটার–শ্রমও পণ্য, এটির বেচা-কেনা করা হয়। মজুরির বিনিময়ে শ্রমের বিক্রি হচ্ছে পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। (আহমেদ, রেহনুমা; চৌধুরী, মানস; পৃষ্ঠা নং : ১১৫, ১১৬; ২০০৩)

জেমস ক্লিফোর্ড ও মার্কাসের Writing Culture গ্রন্থখানি গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে উত্তর-আধুনিকতাবাদের ইঙ্গিতবাহী একটি মৌলিক গ্রন্থ। সাহিত্য রচনার অনুসৃত পদ্ধতিই নৃবৈজ্ঞানিক টেক্সটে প্রতিফলিত হওয়া উচিৎ। তবে এথনোগ্রাফী রচনায় ক্ষমতার সম্পর্ক কিভাবে লেখনিকে প্রভাবিত করে তার পরীক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। Writing Culture গ্রন্থের ভূমিকায় জেমস ক্লিফোর্ড উল্লেখ করেন, কোন এথনোগ্রাফী, এমনকি স্বজাতিক গবেষকের মাধ্যমে রচিত হলেও, কখনো অবিকল সত্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়ন করতে পারে না। এদিক থেকে তিনি এথনোগ্রাফীকে একটি কবিতার সাথে তুলনা করেছেন। এ কারণেই ক্লিফোর্ড যেকোন এথনোগ্রাফীকে 'Narrative Character of Culture Representations হিসেবে অবিহিত করেছেন। একই সুরে জর্জ মার্কস এথনোগ্রাফী রচনায় ব্যবহৃত পরিভাষায় রচনাকারীর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন।
(চৌধুরী, আহমেদ ফজলে হাসান; পৃষ্ঠা নং : ২৩৩; ২০০৩)

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে সবচেয়ে শক্তিশালী তত্ত্বটি প্রদান করেছেন মিশেল ফুকো। সাম্প্রতিক কালের কালচারাল স্টাডিজ ফিল্ডের একটি কেন্দ্রিয় প্রত্যয় হচ্ছে ডিসকোর্স। সহজভাবে ডিসকোর্স বলতে বোঝায় কোন বক্তব্য কিংবা ভাষার কোন নির্দিষ্ট টুকরো। এটি বিদ্যা জাগতিক অধ্যায়নের দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু জড়িত পরিক্ষেত্রে প্রধানত ব্যবহৃত হয়। ভাষাবিদ্যাগত ডিসকোর্স বিশ্লেষণ এবং উত্তর-কাঠামোবাদী ডিসকোর্স তত্ত্ব। প্রাগম্যাটিক্স , যেটি হচ্ছে ভাষা বিদ্যার সেই শাখা যেটি ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশন অধ্যায়ন করে। ডিসকোর্স বলতে বোঝায় ভাষার ব্যবহার, যা-ভাষা হচ্ছে একটি 'বিমূর্ত ব্যবস্থা'–ধারণাটির বিপরীত, ডিসকোর্স পদ্ধতির এই বিশেষ ব্যবহার সেটিকে language এর তুলনায় parole এর অনেক কাছাকাছি নিয়ে যায়। মিশেল ফুকো ডিসকোর্স পদটিকে ভিন্ন অর্থ প্রদান করেন। ফুকোর আগ্রহের বিষয় ছিল সেই নিয়মাবলী ও অনুশীলন যেগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বকালে অর্থবহ বক্তব্য উৎপাদন করে, ডিসকোর্স নিয়ন্ত্রণ করে। ফুকোর দৃষ্টিতে ডিসকোর্স হচ্ছে : এক রাজি বক্তব্য যা কথা বলার একটি ভাষা–জ্ঞান পরিবেশনের, একটি ধরন–প্রদান করে। ফুকো বলেন, ডিসকোর্স মাত্রই গঠিত হয় একটি নির্দিষ্ট টপিককে কেন্দ্র করে, একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে। ডিসকোর্স হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান উৎপাদন। কিন্তু, ফুকো বলেন, 'অর্থ যেহেতু সকল সামাজিক অনুশীলনের অবিচ্ছেদ্যাংশ, এবং অর্থ আকৃতি দান করে, আমরা যা করি সেটিকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ, আমাদের আচরণকে, সে কারণে, সকল অনুশীলনেরই রয়েছে ডিসকার্সিভ দিক।' এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ফুকো অনুসারে ডিসকোর্স প্রত্যয়টি সম্পূর্ণরূপে ভাষাবিদ্যাগত নয়। এটি ভাষা ও অনুশীলন, দুটোকেই ঘিরে। এটি যা বলা হয় (ভাষা) এবং যা করা হয় (অনুশীলন), এই দুইয়ের মধ্যকার প্রথাগত বিভাজনকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। ফুকোর বক্তব্য হচ্ছে, ডিসকোর্স টপিক বা প্রসঙ্গ নির্মাণ করে। এটি জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তু সংজ্ঞায়িত করে, সেটিকে উৎপাদন করে। একটি টপিক নিয়ে অর্থবহভাবে কথাবার্তা বলা, সেটি নিয়ে যুক্তিতর্ক দাড় করানো–ডিসকোর্স এটিকে শাসন করে। চিন্তা কিভাবে অনুশীলন লাভ করে এবং সেটি কিভাবে অপরের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়, ডিসকোর্স সেটিকেও প্রভাবান্বিত করে। ডিসকোর্স একই সাথে কোনো বিশেষ টপিক নিয়ে কথা বলার ধরণ, গ্রহণযোগ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন উপায়ে কথা বলা, লেখা কিংবা চলাফেরা করাকে বিধিভুক্ত (Rules in) করে; এটি আবার একই সাথে সেই টপিক কিংবা সেই সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন সাপেক্ষে কথা বলার এবং চাল চলনের ধরণ সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে। সংক্ষেপে বললে 'বিধি বহির্ভূত' (rules out) করে। ফুকোর যুক্তিতর্ক

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে, ডিসকোর্স কখনোই একটি মাত্র বক্তব্য কিংবা একটি মাত্র গ্রন্থ বা একটি মাত্র ক্রিয়া কিংবা একটি মাত্র সূত্রকে ইঙ্গিত করে না। একই ডিসকোর্স, যেটি ভাববার ধরন কিংবা জ্ঞানের দশাকে বিশিষ্টতা দান করে (এটিকে ফুকো এপিস্টিম ডাকেন), সেটি নানাবিধ গ্রন্থ এবং আচরণের ধরন হিসেবে সমাজের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিভূমিতে পরিলক্ষিত হবে। তবে, যখনই এই ডিস্কার্সিভ ঘটনাবলীসমূহ একই লক্ষ্যবস্তুতে শরণাপন্ন হয়, একই ঢং প্রদর্শন করে, একই কৌশল সমর্থন করে কিংবা একই প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক কিংবা রাজনৈতিক প্রবাহ বা ছকে অংশীদারী, তখন ফুকোর মতে, এগুলো একই ডিস্কার্সিভ ফর্মেশনের অংশ।

এ মতে ফুকো বলেন, ডিসকোর্সের ভিতরেই অর্থ এবং অর্থবহ অনুশীলন, নির্মিত। ফুকো সেমিওটিশিয়ানদের মতই নির্মাণবিদ। কিন্তু ফারাক এখানেই যে তিনি ভাষার পরিবর্তে ডিসকোর্সের মাধ্যমে জ্ঞান ও অর্থের উৎপাদনের উপর জোরারোপ করেন। অর্থের নির্মাণবাদী তত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে এই ধারণাটি যে, বস্তুগত জিনিস ও ক্রিয়াকর্ম বিদ্যমান কিন্তু এগুলো কেবলমাত্র ডিসকোর্সের ভিতরেই অর্থ লাভ করে এবং জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ফুকোর যুক্তি হচ্ছে, বস্তু কিংবা জিনিসের সম্বন্ধে আমরা তখনই জানি যখন, সেগুলোর অর্থ থাকে; এবং জ্ঞান উৎপাদন করে ডিসকোর্স, কোন বস্তু খোদ জ্ঞান উৎপাদন করতে পারে না। 'পাগলত্ব', 'শাস্তি', যৌনত্ব এ ধরনের বিষয় কেবলমাত্র ডিসকোর্সের ভিতরেই অর্থ লাভ করে।

অর্থাৎ পাগলত্ব, শাস্তি, যৌনত্ব–এ সংক্রান্ত ডিসকোর্স অধ্যায়নে নিম্নোল্লিখিত উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়-

১. পাগলত্ব, শাস্তি, যৌনত্ব বিষয়ে বক্তব্যসমূহ যা আমাদের এসব বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের জ্ঞান প্রদান করে।

২. সে সকল নিয়ম যা এ সকল টপিক নিয়ে কথা বলার ধরন অনুমোদিত করে এবং অন্য ধরন নিষিদ্ধ করে–একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে পাগলত্ব, শাস্তি, যৌনত্ব বিষয়ে কী বলা ও ভাবা যাবে তা এ সকল নিয়মাবলী অনুশাসন করে।

৩. সাবজেক্ট যারা এই ডিসকোর্সসমূহকে ব্যক্তিরূপী বা পার্সোনিফাই করে তোলেন–পাগল, হিস্টিরিয়াগ্রস্তনারী, অপরাধী, অস্বাভাবিক আচরণকারী, বিকৃত যৌন রুচিসম্পন্ন, সেই বৈশিষ্ট্যাবলীসহ যা এই সাবজেক্টদের মধ্যে আমরা আশা করে থাকি, যেহেতু এই টপিক সম্পর্কে জ্ঞান সে সময়কালে বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এই টপিক সম্পর্কিত জ্ঞান কিভাবে কর্তৃত্ব লাভ করে। কিভাবে মূর্তমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়; একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে এটি আসল সত্য হিসেবে গঠিত হয়।

৫. প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এই সাবজেক্টগণের সাথে কি উপায়ে কারবার করা হবে যে অনুশীলন–পাগলকে প্রদত্ত স্বাস্থ্যগত চিকিৎসা, অপরাধীদের জন্য শাস্তির অনুশাসন, যৌন অস্বাভাবিক আচরণকারীদের জন্য নৈতিক শৃঙ্খলা–যা সেসব ধারণা মোতাবেক তাদের নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করে।

৬. একটি ভিন্ন ডিসকোর্স কিংবা এপিস্টিম পরবর্তী ঐতিহাসিক মুহূর্তে যেটি আর্বিভূত হবে সেটির স্বীকৃতি। এটি বিদ্যমানটিকে প্রতিস্থাপন করবে, একটি নতুন ডিসকার্সিভ ফর্মেশন উন্মুক্ত করবে এবং পাগলত্ব, শাস্তি, যৌনত্বের নতুন প্রত্যয়ন উৎপাদন করবে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন নতুন ডিসকোর্স যেগুলো নতুন উপায়ে সামাজিক অনুশীলন এবং 'সত্য' পরিচালনা করবে।

ফুকোর নিকট পাগলত্ব কিংবা যৌনত্ব বা অপরাধ কোন বস্তুগত সত্য বা অব্জেক্টিভ ফ্যাক্ট নয়, যেটি সকল ঐতিহাসিক পর্বকালে কিংবা সকল সংস্কৃতিতে একই অর্থ বহন করে। যেমন ধরুন : যৌনত্ব। ফুকো বলেন : একটি বিশেষ ঢঙে যৌন আকাঙ্ক্ষা, যৌনতার গুপ্ততা এবং সে সংক্রান্ত সকল ফ্যান্টাসি নিয়ে কথা বলা, অধ্যায়ন করা এবং পরিচালনা করা পশ্চিমা সমাজে, কেবলমাত্র একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে, 'যৌনতা' হিসেবে আর্বিভূত হয়। তিনি বলেন, আমরা বর্তমানে সমকামী ধরনের আচরণ বলতে যা বুঝি সেটি সম্ভবত সকল কালেই বিদ্যমান ছিল কিন্তু একটি বিশিষ্ট ধরনের সামাজিক সাবজেক্ট হিসেবে 'সমকামী'কে উৎপাদন করা হয় এবং এটি কেবলমাত্র উনবিংশ শতকের শেষভাগের নৈতিক, আইনী, চিকিৎসাগত ও মনোবিদ্যাগত ডিসকোর্স, অনুশীলন এবং প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্রপাতিসমূহের মাধ্যমেই, সেগুলোর যৌন বিকৃতিপনার বিশিষ্ট তত্ত্বসহ আর্বিভূত হতে পারত। একইভাবে, 'হিস্টেরিক্যাল নারী' সম্বন্ধে উনবিংশ শতকীয় ভাবনার বাইরে কথা বলা সম্ভব নয় যেটি অনুসারে হিস্টিরিয়া হচ্ছে একটি ব্যাপৃত নারীগত রোগ।

সাবজেক্টের প্রথাগত প্রত্যায়ন সম্পর্কে ফুকোর ছিল গভীর সমালোচনা। প্রথাগত ভাবনাচিন্তায়, 'সাবজেক্ট' হচ্ছে একজন ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যসম্পন্ন; একটি স্বতন্ত্র এবং স্থিতিশীল সত্তা। আমরা যখন নিজেদের কথা বলতে শুনি, তখন যা বা বলেছি, আমরা সেটির সাথে একাত্মবোধ করি।

Dhaka University Institutional Repository

যা যা বলেছি, সেটির সাথে সাবজেক্টের একাত্মবোধ, সাবজেক্টকে, অর্থের সাপেক্ষে, একটি সুবিধাজনিত অবস্থায় স্থাপন করে এই অর্থে যে, ধরে নেয়া হয় অন্য মানুষজন আমাদের ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু আমরা নিজেকে সবসময় সঠিকভাবে বুঝি যেহেতু আমরা নিজেরাই হচ্ছি অর্থের উৎস।

ফুকোর প্রস্তাবসমূহের সবচাইতে দুর্দান্ত দিকসমূহের একটি হল : সাবজেক্ট ডিসকোর্সের ভিতরে উৎপন্ন হয়। ডিসকোর্সের সাবজেক্ট ডিসকোর্সের বাইরে হতে পারে না, কারণ তার ডিসকোর্সের অধীনস্ত হতেই হবে। ডিসকোর্স যে ধরনের জ্ঞান উৎপাদন করে সাবজেক্ট সেটির ধারক-বাহক হতে পারে। ক্ষমতা যেটির মাধ্যমে প্রবাহিত হয় সাবজেক্ট সেটির লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। কিন্তু, সাবজেক্ট উৎস ও রচয়িতা হিসেবে ক্ষমতা / জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে না। ফুকো বলেন, সাবজেক্টের রয়েছে দুটি অর্থ : অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ ও নির্ভরশীলতার অধীন এবং বিবেক ও স্ব-জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ পরিচিতির সাথে আবদ্ধ। উভয় অর্থই এমন এক ধরনের ক্ষমতা ইঙ্গিত করে যেটি অধস্তন করে, অধীনস্ত করে। সমালোচকদের মতে, ফুকো ডিসকোর্সকে যেমন ঐতিহাসিক করেছেন, ঠিক একইভাবে সাবজেক্টকেও ঐতিহাসিক করেছেন। ফুকো বলেন, গঠিত সাবজেক্টের ধারণা, এমনকি খোদ সাবজেক্টের ধারণাই আমাদের বাতিল করতে হবে। আমাদের এমন বিশ্লেষণে পৌঁছুতে হবে যেটি একটি ঐতিহাসিক পরিকাঠামোর ভিতরে সাবজেক্টের গঠনের হিসেব নিকেশ দাঁড় করাতে পারবে। (আহমেদ, রেহনুমা; চৌধুরী, মানস; পৃষ্ঠা নং : ২৬১-২৬৩; ২০০৩)

এই গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে মিশেল ফুকোর তত্ত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী। ফুকো যখন প্রতাপের ছায়ায় বন্দীশালা, চিকিৎসালয়, যৌনতা, নৈতিকতা ও সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে লালিত হতে দেখেন–আমরাও নতুন চোখে যেন আমাদের পৃথিবীটাকে দেখতে শিখি। মূলত, সবকিছুর উপরে ফুকো দেখান, তত্ত্ব-সন্ধান নিছক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নয়, অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার সঙ্গেও তা নিবিড় ভাবে সমন্বিত। যেমন : আমি আমার গবেষণার প্রেক্ষাপটে বলতে পারি, বর্তমান সময়কালে বাংলাদেশে হরিজনরা একটি অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দেশে বসবাসকারী অন্যান্য বাংলাদেশীদের তুলনায় হরিজনরা সমাজে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত ও অবহেলিত। ফলে তারা ধরেই নিয়েছে তারা ক্ষমতাহীন, অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় তারা দুর্বল। তাই নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের এই মানসিকতা একদিনে তৈরি হয়নি বরং বছরের পর বছর প্রতাপের ছায়ায় থাকতে থাকতে হরিজনদের এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আধুনিক সমাজের প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ-সুবিধাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। সবকিছুই Fake বা ভুয়া মনে করে। ফুকো যখন বারবার বলেন 'Everything is Fake' তখন গবেষক হিসেবে গণকটুলীর হরিজনদের পরিবর্তনশীল সত্যকে তুলে ধরা আমার জন্য সহজ হয়। চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছা করে গবেষিত জনগোষ্ঠীর বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বঞ্চনা, প্রেম, যৌনতা ইত্যাদি সকল কিছুকে।

১.৭ সাহিত্য পর্যালোচনা :

বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা খুব কম করা হয়েছে। হাতে গোনা দু'একটি কাজ যা করা হয়েছে তাতে মূলত হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই হরিজন সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করতে গিয়ে কেবলমাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নয় বরঞ্চ ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে যে সকল গবেষণা কর্ম হয়েছে সেগুলোর ওপরও নজর দেওয়া হয়েছে। গবেষণা কর্মগুলো নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক. A Asaduzzaman; The Pariah People: An Ethnography of the Urban Sweepers In Bangladesh (2001):

The Pariah People গ্রন্থে লেখক ঢাকা শহরে বসবাসরত তেলেগু মেথরদের জীবনযাত্রা এবং সমাজের সাথে তাদের খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছেন। তাদের পরিচয়, পদ-মর্যাদা, মানসম্মান ইত্যাদি বিষয়গুলোতে জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর গবেষণাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে তাদের সম্প্রদায়গত জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে সামাজিক সংগঠন, পরিচয়, সামাজিক রীতিনীতি ও কার্যাবলীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উঠে এসেছে দলাদলি সামাজিক যোগাযোগ, আন্তঃশ্রেণীর মাঝে বিভিন্ন নিয়মরীতি, বিয়ের রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়। দ্বিতীয়ভাগে তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলো এবং আচার অনুষ্ঠানের ক্রিয়াগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, খ্রিষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, গবেষক তাঁর গবেষণায় মেথর শব্দের অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ. F.G. Bailey; Caste and the Economic Frontier (1957):

এফ.জি বেইলী উড়িষ্যার পার্বত্য কৃষকদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা আদিবাসী লোক, বর্ণপ্রথায় বিভক্ত। তারা সামাজিক স্তরের বিভিন্ন ভাগের নিরিখে সমগ্র সমাজকে দেখে থাকেন। বইটিতে গবেষিত এলাকায় চার ধরনের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। গবেষকের গবেষিত এলাকা ছিল বিসিপাড়া গ্রাম। তিনি তাঁর গবেষিত গ্রামে ঝাড়ুদারদের ক্রমোত্তরায়নের শেষ বর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

গ. জেমস ওয়াইজ, এম.ডি; পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ, দ্বিতীয় ভাগ : ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকা–মুনতাসীর মামুন (২০০০) :

উনিশ শতকের সত্তর দশকে ঢাকার সিভিল সার্জন থাকাকালে জেমস ওয়াইজ (জেমস ফওনস্ নর্টন ওয়াইজ) এই বইটির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল ঢাকা জেলা এবং এই জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসমূহ।

ওয়াইজের বইটির নাম ছিল নোট্স অব রেসেস, কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস্ অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল (১৮৮৩) বাংলা অনুবাদে যার নাম দেওয়া হয়েছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। বইটি মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মুহামেডান, দ্বিতীয় ভাগে রিলিজিয়াস সেক্টর অব দি হিন্দুজ, তৃতীয় ভাগে হিন্দু কাস্টস অ্যান্ড এবরেজিনাল রেসেস, চতুর্থ ভাগে আর্মেনিয়ানস্ ও পঞ্চম ভাগে পর্তুগিজ ইন ইস্টার্ন বেঙ্গল।

ওয়াইজের লেখা মূল বইটি প্রকাশ হয়েছিল একশো বছরেরও আগে। ওয়াইজের রচনা সমসাময়িক তো বটেই, পরবর্তীকালেও অনেক নৃতাত্ত্বিক, সমাজ বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াইজকে পূর্ববঙ্গের নৃতত্ত্বচর্চার পথিকৃৎ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঘ. শেখর বন্দোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত; জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ (১৯৯৮) :

জাতি বর্ণ ও বাঙালী সমাজ বইটি এ ধরনের গবেষণা রচনায় অত্যাবশ্যকীয়। বইটিতে মোট আটজন গবেষক তাদের প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তারা হলেন হিতেশরঞ্জন সান্যাল, আন্দ্রে বেতেই, পার্থ

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায়, নির্মল কুমার বসু, শেখর বন্দোপাধ্যায়, শিনকিচি তানিগুচি, সুরজিৎ সিংহ, রনজিৎকুমার ভট্টাচার্য। এরমধ্যে বর্তমান গবেষণার জন্য এই বইয়ের ভূমিকাসহ মোট চারটি প্রবন্ধ সাহিত্য পর্যালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হল :

১. **বঙ্গদেশে জাতি ব্যবস্থ : কয়েকটি প্রসঙ্গ–নির্মল কুমার বসু**
২. **জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা–পার্থ চট্টোপাধ্যায়**
৩. **পদ মর্যাদা : মূল্যায়ন ও ক্রমোচ্চবিন্যাস–আন্দ্রে বেতেই**
৪. **বাংলায় জাতির উৎপত্তি–হিতেশ রঞ্জন সান্যাল।**

১. বঙ্গদেশে জাতি ব্যবস্থা : কয়েকটি প্রসঙ্গ–নির্মল কুমার বসু (এই প্রবন্ধটি নির্মল কুমার বসুর 'সাম অ্যাসপেক্টস অব কাস্ট ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, অনুবাদ করেছেন শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়) :

নির্মল কুমার বসু তার প্রবন্ধে দেখান, যে সমস্ত জাতির হাত থেকে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করেন না তার একটি তালিকা।

সেই তালিকায় নাম পাওয়া যায় মুচি, ভুঁইমালী, ফুলমালী, রাজবংশী, ভড়, মাল, কোনাই, বাউরি, ডোম, কোরা সাঁওতাল ও জেলের। নাম অনুযায়ী কৌলিক বৃত্তিগুলো হল : মুচির কাজ চামড়া খালানো, পাকানো ও জুতা তৈরী; ভুঁইমালীর কাজ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করা; ফুলমালীর কাজ বাগান করা ও পূজার ফুল যোগান করা; রাজবংশীর কাজ কৃষি শ্রমিক ও মাঝিমাল্লার কাজগুলি করা, ভড় সমাজে চিড়াপ্রস্তুতকারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন; মাল, কোনাই, বাউরি তিনটি সম্প্রদায়ই কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন; ডোম বাঁশের কাজ ও ঝুড়ি বানানো; কোরা সাঁওতাল মাটি কাটা, শ্রমিকের কাজ এবং জেলে মাছ ধরার কাজ করেন।

দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৮ ভাগই সমাজের সেই অংশ যাদের হাত থেকে উচ্চ বর্ণের লোকেরা, যেমন : ব্রাহ্মণ, বৈদ্য জল গ্রহণ করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

২. জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা–পার্থ চট্টোপাধ্যায় (এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় রণজিৎ গুহ সম্পাদিত Subaltern Studies Vol. VI গ্রন্থে, অনুবাদ করেছেন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়) :

পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে লুই দুমোকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। বারনার্ড কোনের পৃথকীকরণ তত্ত্বের পরিমার্জিত করে লুই দুমো তাঁর বিতর্কিত Homo Hierarchicus গ্রন্থে বলেন, শুচি/অশুচির ধর্মীয় চেতনায় ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় গঠনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হল ক্রমোচ্চ বিন্যাস, যেখানে শুচি/অশুচির মানদন্ডে প্রতিটি জাতির পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। এক সার্বজনীন ধর্মের শক্তি জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র সমাজটিকে একত্রে ধরে রাখে। ধর্মের অবগত শক্তির কাছে যাবতীয় ঐহিক ক্ষমতা এখানে পরাভূত হয়।

এই প্রবন্ধে আন্টনিও গ্রামশির সাধারণ বোধ (Common Sense) নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। প্রিজন নোটবুকস্ এর নির্বাচিত অংশের তৃতীয় ভাগে যার নাম The Philosoply of Praxis- আন্টনিও গ্রামশি সাধারণ বোধ (Common Sense) এর একটি চরিত্র নির্ধারণ করেছেন। সাধারণ শ্রমিক-জনতার মধ্যে সক্রিয় ব্যক্তি-ব্যবহারিক জীবিকায় নিয়োজিত। নিজের কাজকর্ম করবার জন্যই পৃথিবী তথা পরিপার্শ্ব বিষয়ে তাঁর সাধারণ ধারণা বা বোধ প্রয়োজন, যাকে তাঁর নিত্যকর্মেই নিয়ত পরিবর্তন করে থাকে। কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষ কর্মধারা বিষয়ে কোনো স্পষ্ট তাত্ত্বিক চেতনা তাঁর থাকে না, বরং তাঁর তাত্ত্বিক চেতনা ঐতিহাসিকভাবে তাঁর কাজের বিরুদ্ধাচারী হতে পারে। এমন কি বলা যেতে পারে তাঁর দুটি তাত্ত্বিক চেতনা (অথবা একটি পরস্পর বিরোধী চেতনা) রয়েছে; একটি নিহিত থাকে তাঁর কাজের মধ্যে যা তাঁকে এই পার্থিব জগৎকে কার্যকরভাবে রূপান্তরণের কাজে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে বাস্তবে একাত্ম করে; আর অন্যটি প্রকাশ পায় ভাসা-ভাসা ভাবে কথোপকথনের মধ্যে, যা তিনি অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পান এবং কোন সমালোচনা ছাড়াই গ্রহণ করেন।

চেতনার এই স্ববিরোধকে আরও বিশ্লেষণ করে গ্রামশি, এর প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন দিকগুলির মধ্যবর্তী বিরোধকে প্রতিপক্ষ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অন্তবর্তী দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন রূপে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এখানে নিম্নবর্গের চেতনা বিশ্লেষণ পদ্ধতির এক সম্ভাব্য সূত্র পাই। এই চেতনাকে আমরা দেখি স্ববিরোধী ও খন্ডিতরূপে। অনেকটাই এলোমেলোভাবে একত্রে ধৃত–যাকে বলা যেতে পারে সাধারণ বোধ। যা অনিশ্চিত, পরস্পরবিরোধী এবং বহুরূপ এক ধারণা।

৩. পদ মর্যাদা : মূল্যায়ন ও ক্রমোচ্চ বিন্যাস–আন্দ্রে বেতেই (এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় Inequality among Men গ্রন্থে, অনুবাদ করেছেন অভিজিৎ দাশগুপ্ত) :

আন্দ্রে বেতেই বর্ণ শব্দ নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে বর্ণ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। এর অর্থ রঙ। গত শতাব্দীতে চতুবর্ণ শ্রেণীভেদ বলতে গায়ের রঙের বর্ণভেদ বোঝায় আর এই সম্পর্কের ভিত্তি হল হিন্দুদের বংশগত পার্থক্য। জাতি ও রঙের সম্পর্ক যেমন : ব্রাহ্মণ ফরসা, ক্ষত্রিয় লাল, বৈশ্য হলুদ, শুদ্র কালো; তা শুধু এক ধরনের সাংকেতিক অর্থবহন করে। প্রকৃত অর্থ ভিন্ন।

ব্রাহ্মণেরা সাত্ত্বিক অর্থাৎ স্বত্ব গুণান্বিত। স্বত্ত্ব শব্দটির অর্থ শুচি। কিন্তু এই অর্থ ছাড়া আরও কিছু অর্থ রয়েছে। স্বত্ব বলতে আমরা সত্য, জ্ঞান, তপস্যা বুঝে থাকি। শ্বেত বর্ণের সাথে সম্পর্কযুক্ত সত্ত্ব।

পবিত্রতার মাত্রার ক্রমহ্রাস ঘটে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের প্রদর্শিত গুণাবলীতে। লালের সাথে সম্পর্ক রজ:গুণের। দ্বিতীয় গুণ রজঃ বলতে বোঝায় শৌর্য, শক্তি। এর নিহিত অর্থ বলতে সেইসব গুণের কথা বোঝায় যা হিন্দু রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রজঃ বলতে ক্ষত্রিয় বোঝায়।

কালোর সাথে সম্পর্ক তমঃ গুণের। তৃতীয় গুণ তমঃ বলতে শুধুমাত্র অন্ধকার বোঝায়। এর অর্থ অশুচিতা। তাই তমঃ শব্দ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বনিম্ন তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা শুদ্রদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝায়। আর বৈশ্যদের মধ্যে রয়েছে দুটি গুণের সমন্বয়। রজঃ ও তমঃ। আর তার নিচে যারা রয়েছে তাদের বলা হয় চন্ডাল, অস্পৃশ্য অথবা হরিজন। বস্তুত এই অস্পৃশ্যদের পেশা, খাদ্য, আচার-ব্যবহার সবকিছুই অশুচি হিসেবে গণ্য হয়। তাই এদের স্থান সমাজের শ্রেণী ব্যবস্থার সবচাইতে নিচে। নিম্নতম বর্ণের হিন্দুগণ কোন গুণই প্রদর্শন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বাংলায় জাতির উৎপত্তি–হিতেশ রঞ্জন সান্যাল (প্রবন্ধটি প্রকাশ করে প্যাপিরাস প্রকাশনা সংস্থা, অনুবাদ করেছেন শ্রীলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়) :

হিতেশ রঞ্জন সান্যাল বর্ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বর্ণের অর্থ হল গুণ। সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব প্রবণতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশিত একটি সহজাত গুণের এক একটি বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রাহ্মণেরা শিক্ষিত পুরোহিত শ্রেণীর মানুষ, তাদের পেশা ছিল শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং শিক্ষা প্রদান। রাজপদ অলংকরণ ও সৈন্যবাহিনী গঠন করল ক্ষত্রিয়রা। বৈশ্যরা ছিলেন কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী। সর্বশেষে ছিল ক্ষুদ্র বা চাকরশ্রেণী।

ঋকবেদে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা মহাপুরুষ অর্থাৎ সেই সর্বোচ্চ অস্তিমানের মুখ থেকে উদ্ভত, ক্ষত্রিয়রা তাঁর বাহু, বৈশ্যরা তাঁর উরু এবং শুদ্রগণের উদ্ভব হয়েছে তাঁর পা থেকে।

৬. Andre Beteille; Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village (1965):

বইটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমা দেওয়া আন্দ্রে বেতেই এর পিএইচডি থিসিসের একটি পরিমার্জিত রূপ।

বেতেই দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রামে বর্ণ, শ্রেণী ও ক্ষমতার বিষয়সমূহ নিরীক্ষণ করেন এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের মত বৃহত্তর বিষয়ের সঙ্গে তাদেরকে সম্পর্কিত করেন। তিনি যে গ্রামটিতে গবেষণা করেন সেখানে জমি একটি পণ্যে পরিণত হয় এবং যেই প্রক্রিয়ায় জমি এই ধরনের রূপ পরিগ্রহ করে সেই প্রক্রিয়ায় বর্ণ ও কৃষি পদক্রমে এক ধরনের পরিবর্তন সাধন করে। তিনি গ্রামের জনসাধারণকে দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রথমত: জাতিবর্ণ প্রথা ভিত্তিতে, যেমন : ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ও আদি দ্রাবিড়ীয়। দ্বিতীয়ত: জমি মালিক, বর্গাদার ও কৃষি মজুরদের শ্রেণীগত সম্পর্ক। বেতেই মূলত এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্কের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চ. J. Arens and J.V. Beurden; Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh (1980):

ইয়েনেক আরেন্স ও ইওস ফান বুয়েরদেন এক ওলন্দাজ দম্পত্তি। 'ঝগড়াপুর' তাদের মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্ব অবলম্বনে বাংলাদেশের কৃষক সমাজের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা। কৃষিক্ষেত্রে বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণীসংগ্রাম অনুসন্ধান তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হলেও কৃষক সমাজে নারীশ্রম শোষণ এবং নারীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাও ছিল তাঁদের গবেষণার বিষয়।

পূর্ববাংলার কৃষক সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থা উদ্‌ঘাটনের প্রথম কৃতিত্ব তাদেরই। এই দম্পতি নৃবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক সমাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

নারী শোষণকে আরেন্স ও বুয়েরদেন দুটো অংশে ভাগ করেছেন। যথা : (১) যৌন শোষণ
(২) অর্থনৈতিক শোষণ।

তারা দেখিয়েছেন যে, যৌনসুখ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য এবং নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নারীকে কখনোই যৌন সঙ্গী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়ত, সমাজে নারীর অবস্থান দুর্বল বলেই তাদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণটি অত্যন্ত নির্মম। গৃহস্থালীর কাজকর্মের মাধ্যমেই নারীর অর্থনৈতিক শোষণটি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নারী অসহায় বলেই তাদের ওপর পীড়নটি দ্বিগুণ হয়।

ঝগড়াপুরে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে জীবন ও সমাজ পুরুষ শাসিত। মেয়েরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করে পর্দার আড়ালে। বাঙালী নারী জীবনের গুণাবলী–ধৈর্য, ত্যাগ ও সহনশীলতার ধারণা তার মনে গেঁথে দেওয়া হয়। নিজের হীন মর্যাদা স্বীকার করে নিতেও তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যৌবনের শুরু থেকেই মেয়েরা পর্দা মেনে চলতে শুরু করে। তার কাছ থেকে নম্র ও লাজুক আচরণ আশা করা হয়, বিশেষ করে পুরুষদের সামনে। প্রথম দিকে যারা খালি গায়ে শুধুমাত্র একটি ঘাগড়া পড়ে এখানে সেখানে ছুটাছুটি করে বেড়াতো তাদেরকেই শেষের দিকে গবেষকদ্বয় দেখেছেন শাড়ী পরে, নিজেদের প্রানোচ্ছলতাকে সীমিত করে ছোট ছোট মহিলায় রূপান্তরিত হতে।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. Pauline Kolenda; 'The Caste System Analyzed: Purity and Pollution,' in Caste in Contemporary India: Beyond Organic Solidarity (Rawat Publications, New Delhi), 1997 (Benjamin/Cummings Publishing Co. 1978), reprinted in T.N. Madan, Religion in India, Oxford UP, 1991:

এই প্রবন্ধটিতে গুণতত্ত্বের সাথে খাদ্যের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে। Cool Foods যেমন : দুধ, পরিশোধিত মাখন, অধিকাংশ ফল, সবজি এগুলো স্বত্ত্ব গুণ তৈরি করে। Hot Foods যেমন : মাংস, ডিম, পেয়াজ, আম ইত্যাদি রজঃ গুণ তৈরি করে। ফুটন্ত, নষ্ট ইত্যাদি খাবার তমঃ গুণ তৈরি করে। যেমন : গরুর মাংস, মদ ইত্যাদি।

যারা অস্পৃশ্য শ্রেণী তারা সাধারণত তমঃ গুণ সম্পন্ন খাবারগুলো দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে গ্রহণ করে থাকেন।

জ. নীহার রঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (বাংলা ১৩৫৬) :

বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ের বর্ণ বিন্যাস, সপ্তম অধ্যায়ের শ্রেণীবিন্যাস এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের ধর্মকর্ম ধ্যান ধারণাকে সাহিত্য পর্যালোচনায় নেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সৎ শুদ্র, অসৎ শুদ্র, বর্ণ ও শ্রেণী, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর সম্পর্ক, বর্ণ ও রাষ্ট্র, অধম শংকর বা অন্ত্যজ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা সাহিত্য পর্যালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শ্রেণীবিন্যাস অংশে সমসাময়িক সাহিত্য, রাজপাদোপজীবী শ্রেণী, রাজসেবক শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে মূলত বিদ্যমান ধর্মগুলোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আর্যপূর্ব, আর্যতর ও বৈদিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. কার্ল মার্ক্স; ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম, ১৮৪৮-১৮৫০ (১৮৫০) :

গবেষণায় কার্ল মার্ক্স ফরাসী কৃষকদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। মার্ক্সের দেওয়া এই পরিচয়টি কেবলমাত্র ফরাসী কৃষকদের জন্য নয় বরঞ্চ গবেষণাধীন গণকটুলীর হরিজনদের জীবনের সাথেও মিলে যায়। নিম্নে মার্ক্সের লেখা থেকে হুবুহু তুলে ধরা হল।

"সেই স্থূল, ধূর্ত, পাষন্ড বাতুল, মূঢ় মহীয়ান, এক সুচিন্তিত কুসংস্কার, এক করুন প্রহসন, সুচতুর নির্বোধ এক কালবিরোধিতা, এক বিশ্ব ঐতিহাসিক তাঁড়ামি এবং সভ্যমানুষের পক্ষে পাঠোদ্ধারের অসাধ্য এক দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপি–এই ছবিতে সংশয়াতীত পরিচয় রয়েছে সেই শ্রেণীর, যে সভ্যতার মধ্যে বর্বরতার প্রতিনিধি (মার্ক্স, ১৯৭১ খ: ১৬৭)।"

ঞ. Dr. Babashaheb Ambedkar; Writing and Speeches, Vol. 1. Bombay: Education Department, Government of Maharashtra (1979):

বইটির একটি প্রবন্ধকে সাহিত্য পর্যালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। আম্বেদকার কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধটি হল, Castes in India: Their mechanism, Genesis and Development. উল্লেখ্য, ৯ই মে ১৯১৬ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নৃবৈজ্ঞানিক সভায় প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধে ভারতবর্ষের জাতি বর্ণ ব্যবস্থা, তাদের পদ্ধতিসমূহ, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ট. তপোধীর ভট্টাচার্য; মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব (১৯৯৭) :

এই গবেষণায় ফুকো কেন প্রাসঙ্গিক? আধুনিকতার অসম্পূর্ণতা, তার দূরন্ত অবক্ষয়, উপনিবেশোত্তর তৃতীয় বিশ্বে এক বিচিত্র তরঙ্গ তৈরি করে চলেছে। আমরা এমন এক উত্তর মানবতাবাদী জগতে বাস করছি যার দীপায়নোত্তর, উপনিবেশোত্তর, রেনেঁসার উত্তর পরিস্থিতিতে বাঙালির চেনা জগৎ কে অচেনা বলে মনে হয়।

ফুকো যখন বর্তমানের সত্তাতত্ত্বের কথা জানান কিংবা প্রতাপের ছায়ায় বন্দীশালা, চিকিৎসালয়, যৌনতা, নৈতিকতা ও সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে লালিত হতে দেখেন–আমরাও নতুন চোখে যেন আমাদের জগৎকে দেখতে শিখি। দর্শন মানে যে শুধু ভূমার সন্ধান বা আধ্যাত্মবাদী ভাবকল্প নির্মাণ নয় কিংবা ইতিহাস মানে বর্তমানের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত মৃত অতীতের পঞ্জীয়ন নয় কেবল–একথা

Dhaka University Institutional Repository

ফুকোই আমাদের প্রথম জানিয়েছেন। দর্শনের ইতিহাস আর ইতিহাসের দর্শন যে অন্যান্য সম্পৃক্ত যুগলবন্দীর অনুভব; এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপলব্ধিতে আমরা উত্তীর্ণ হই। প্রশ্ন ওঠে, 'আমরা আসলে কারা?' 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' তাই জীবনকে জীবনের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়াই ফুকোর তত্ত্ব। অখন্ড ও অবিভাজ্য মানব-বিশ্ব গড়ে তোলার লড়াইয়ে ফুকোই আমাদের হাতিয়ার।

সংবিধানে সকলের সমান অধিকারের কথা থাকলেও হরিজনরা যখন অধিকার বঞ্চিত হয় তখন বারবার ফুকোর একটি কথাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, 'Everything is Fake'.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণার পদ্ধতি

২.১ গবেষণার পদ্ধতি :

আমার গবেষণায় কিছু মিশ্র গবেষণাপদ্ধতি লক্ষ্যনীয়। এখানে ক্রিয়াবাদী ধারার ম্যালিনস্কি অনুসৃত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি সীমিত ভাবে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ক্রিয়াবাদ এবং তার পরবর্তী ধারাবাহিকতায় সমালোচনামূলক বিতর্কটি মাথায় রেখে উত্তর-আধুনিক ভাবনা-চিন্তা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ :

নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্মের সর্বাপেক্ষা মৌলিক কৌশল বোঝাতে এই পদবাচ্যটি ব্যবহৃত হয়। অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় দৈনন্দিন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, স্থানীয় ভাষা দিয়ে কাজ চালানো এবং গবেষিত মানুষদের দৈনন্দিনতায় তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা। ক্রিয়াবাদের পথিকৃৎ ম্যালিনস্কি এই রীতির অনুসারী ছিলেন। এই পদ্ধতিতে একজন পর্যবেক্ষককে অবশ্যই গবেষিত এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে দীর্ঘদিন বসবাস করতে হবে। গবেষক যেন গবেষিত জনগোষ্ঠীর কাছে অপরিচিত না থাকেন। গবেষককে গবেষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা জানতে হবে এবং তাদের ভাষায় তাদের সাথে কথা বলতে হবে। গবেষিত জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করতে হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সংস্কৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। গবেষককে অবশ্যই একটি ডায়েরী ব্যবহার করতে হবে এবং গবেষিত জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যেতে হবে। গবেষককে তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং তাদের ক্ষতিকর কোনকিছু যেন না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমি নিয়মিত আমার গবেষিত এলাকায় গিয়েছি, গণকটুলীর হরিজনদের কাছে পরিচিত হবে উঠেছি, আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেছি, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছি। আমি যখন আমার গবেষিত এলাকায় যেতাম তখন সবসময়ই একটি ডায়েরী নিয়ে যেতাম। মাঠকর্মে তথ্য সংগ্রহের সাথে সাথে প্রতিদিনই আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অভিজ্ঞতা হত। এগুলো ডায়েরীতে লিখে রাখতাম।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, নিবিড় মাঠকর্ম ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে ক্রিয়াবাদীরা একটি সমাজের গতিশীলতাকে কালানুক্রমিক (Diacronic analysis) এর পরিবর্তে কালকেন্দ্রিক (Synchronic analysis) ব্যাখ্যায় মনযোগী হন। ক্রিয়াবাদীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সমাজ অথবা তার অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কখন কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং কিভাবে ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে তার পরিবর্তে ঐ সমাজ, অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন পদ্ধতিতে সচল এবং ক্রিয়াশীল রয়েছে তা উদঘাটনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

এদিকে সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানীদের অন্যতম ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ মৌলিক প্রশ্নটি তুলেছেন নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নৈতিকতা, বস্তু নিরপেক্ষতা ও বাস্তবতার বিষয় নিয়ে। তিনি মনে করেন, নৃবিজ্ঞানী কোনকিছুর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারে। তাঁর মতে, এথনোগ্রাফি হল নিবিড় বর্ণনা। নিবিড় বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন সমাজের ঘটনাকে এবং সেই সাথে মূলতঃ সংস্কৃতিকে একেবারে তুলে ধরার জন্যে। এই কাজটি করতে হবে Native Point of View থেকে। তিনি আরও মনে করেন, কোন সমাজে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী সব বুঝে ফেলবেন এমন চিন্তা না করে বরং সেই সমাজের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা উচিৎ। বিষয়টি হবে ব্যাখ্যামূলক। Native Point of View বলতে যে সমাজের ওপর গবেষক কাজ করছেন সেই সমাজের নিজস্ব যে মূল্যায়ন, ধ্যান-ধারণা রয়েছে সেগুলোকে তাদের দৃষ্টিতেই উপস্থাপন করা।

গবেষণা কার্যক্রম চালানোর জন্য আমি তাই ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজের ভাবনা-চিন্তাকে মাথায় রেখেছি। মাঠকর্মে যতটুকু সময় ব্যয় করেছি চেষ্টা করেছি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। আমি চেষ্টা করেছি গবেষণায় Emic View অর্থাৎ গবেষিত জনগণ তথা হরিজনদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে।

(খ) সাক্ষাৎকার :

প্রত্যেকটি গবেষণায় সাক্ষাৎকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যাদেরকে নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে গবেষিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অগ্রসর হতে হয়। এটি হচ্ছে একটি Speech Event.

Dhaka University Institutional Repository

আমি আমার গবেষণায় সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন এই তিনটি উপাদান ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন করার সময় বর্ণনামূলক, কাঠামোমূলক ইত্যাদি ভাবে জিগ্যেসার চেষ্টা করেছি। যেমন : বর্ণনামূলক, ঝাড়ুদার কোন সরকারি অফিসে কি কি কাজ করে? কিংবা কাঠামোমূলক, সরকারি ছুটি পেলে তিনি পরিবারকে কিভাবে সময় দিয়েছেন ইত্যাদি। গণকটুলীর সরকারী কলোনীগুলোতে আমি প্রচুর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছি এবং এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি।

(গ) সম্পর্ক তৈরী ও একাত্মতা :

গবেষক যখন গবেষণাধীন সম্প্রদায়ের মুখের ভাষায় কথা বলতে পারেন তখন সম্পর্ক তৈরী করা সহজ হয়। নৃবিজ্ঞানীরা বেশিরভাগই আগে অন্য সংস্কৃতি অধ্যায়ন করতেন। পরবর্তীতে তারা তাদের নিজ সংস্কৃতি অধ্যায়ন শুরু করেন। নিজের সমাজে সম্পর্ক তৈরি বা Rapport Building তুলনামূলক সহজ। Rapport Building এর পূর্বশর্ত তাদের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করা। যেমন : রাঙ্গামাটি জেলার চাকমাদের মাঝে কাজ করতে গেলে একজন চাকমা গবেষকের যত সুবিধা হবে বাঙালী গবেষকের তত সুবিধা হবে না।

গণকটুলী সুইপার কলোনীতে বসবাসরত হরিজনরা বেশিরভাগ বাংলাতেই কথা বলেন। দীর্ঘদিন ধরে এই সমাজে কাজ করতে করতে তাদের জীবনে বাঙালী সংস্কৃতি চরমভাবে বিদ্যমান। তাই তাদের সাথে একাত্মতা করা আমার জন্য সহজ হয়েছে।

(ঘ) Focus Group Discussion (FGD) :

Focus Group Discussion (FGD) মূলত কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট আলোচনা। একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের মধ্যে এটি একটি দলগত আলোচনা। এখানে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারেন।

যেমন : গণকটুলী হরিজন কলোনীতে ৫০ জন ঝাড়ুদারকে আমি ৫টি দলে ভাগ করেছি। প্রত্যেক দলে ১০ জন করে। ৫ জন পুরুষ, ৫ জন মহিলা। অবসরে তারা একত্রিত হয়েছেন এবং আমি সুকৌশলে একটি বিষয় তাদের মাঝে উপস্থাপন করে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। বিষয়গুলোর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বেশির ভাগই ছিল কলোনীর বিদ্যমান সমস্যা। যেমন : নারী-পুরুষ সম্পর্কের টানাপোড়েন, বাসস্থান সমস্যা, পুষ্টিহীনতা, কর্মহীনতা, শিক্ষাহীনতা ইত্যাদি। তারা তাদের বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। যেহেতু আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সকলেই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি জড়িত তাই আলোচনা জমে উঠেছে এবং বাস্তবসম্মত ফল পাওয়া গেছে। তাছাড়া তাদের পূর্বের অনেক অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কেও সাধারণ ধারণা পেয়েছি।

(ঙ) ডায়েরীর ব্যবহার :

গবেষণা কাজের সুবিধার্থে আমি সবসময় একটি ডায়েরী ব্যবহার করেছি। সারাদিন মাঠকর্মে আমি যেসকল তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলো খুঁটিনাটিভাবে ডায়েরীতে লিখে রেখেছি। পরবর্তীকালে আহরিত তথ্যগুলো যেন ভুলে না যাই সেজন্যই এই ব্যবস্থা। গবেষিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লেখার সময় বার বার ডায়েরীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

(চ) ভিডিও ক্যামেরা, ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডারের ব্যবহার :

গণকটুলীর হরিজনদের Living Picture তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাই আমি এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছি। আমি তাদের ছবি তুলেছি, তাদের কথা রেকর্ড করেছি। ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার এগুলো ব্যবহারের আগে গবেষিত জনগোষ্ঠীকে তা অবহিত করেছি এবং তাদের অনুমতি নিয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি তাদের প্রতি আস্থাশীলতার পরিচয় দিতে।

(ছ) প্রশ্নমালা :

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আমি প্রশ্নমালা ব্যবহার করেছি যাতে গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল প্রশ্ন সম্বলিত ছিল। এই পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণ হল, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দ্রুত ও উচ্চমাত্রায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এতে তাদের আস্থা অর্জনে সুবিধা হয়। যেভাবে কথা বললে তারা ভালবোধ করেন সেভাবে সহজ ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করেছি। আমি চেষ্টা করেছি পুরো প্রক্রিয়াটিকে ভালভাবে অনুধাবন করতে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) কেসস্টাডি :

আমি কেস স্টাডি পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি। এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা হল কোন বিষয়, ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করা হয় বলে তার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, ব্যপ্তি আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

২.২ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ :

গণকটুলী সুইপারদের ওপর কাজ করতে গিয়ে দুই ধরনের উৎস থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। যথা : **(a) Primary (b) Secondary**

(a) Primary:

প্রাথমিক উৎসে বা মাঠ পর্যায়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(b) Secondary:

দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হরিজন এবং নিম্ন-শ্রেণীর ওপর লিখিত গবেষণাগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.৩ প্রাপ্ত চলকসমূহের বিশ্লেষণ :

আমার গবেষণার চলকসমূহ হল 'গণকটুলী', 'হরিজন', 'অন্ত্যজ মানুষ', 'জীবনকথা'। নিম্নে চলকসমূহ বিশ্লেষণ করা হল।

ক) গণকটুলী : 'গণকটুলী' ঢাকা শহরের হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে তৈরী সুইপারদের জন্য ৫টি কলোনীসহ নতুন কলোনীগুলো এখানে অবস্থিত। গণকটুলী নামটি প্রায় শত বছরের পুরনো।

খ) হরিজন : হরিজন অর্থ ঈশ্বরের সন্তান। নামটি দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এদেরকে দলিত বা অন্ত্যজ নামেও ডাকা হয়। আধুনিক সমাজের কাছে এরা অস্পৃশ্য বা অচ্ছুত। মূলত, দলিত হচ্ছে তারাই যারা দলনের শিকার।

Dhaka University Institutional Repository

গণকটুলী সুইপার কলোনীতে বসবাসরত বেশিরভাগ বাসিন্দা হিন্দু হরিজন। বাকিরা মুসলমান অ-হরিজন সুইপার। হিন্দু ধর্মের চতুবর্ণের বাইরে হরিজনদের অবস্থান। এদের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বর্ণ ও পেশার জনগোষ্ঠী। যেমন : রবিদাস, ঋষি, শঙ্কর, বেদে, হাজাম, শাহজী, ধোপা, ডোম, মুচিসহ আরো অনেকেই।

গ) অন্ত্যজ মানুষ : নীহাররঞ্জন রায় রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস' 'আদি পর্বে' 'অন্ত্যজ' চলকটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং : ২৪৭)। নিম্নে উল্লেখ করা হল।

অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে রয়েছে ৯টি উপবর্ণ। এরা সকলেই বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত। অর্থাৎ এরা অস্পৃশ্য এবং ব্রাহ্মণ্য-বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে এদের কারও কোন স্থান নেই।

১. মলেগ্রহী (মলেগৃহি)
২. কুড়ব
৩. চন্ডাল (চাঁড়াল)
৪. বরুড় (বাউড়ী)
৫. তক্ষ (তক্ষণকার)
৬. চর্মকার (চামার)
৭. ঘট্টজীবী (পাঠ্যন্তরে ঘণ্টজীবী–খেয়াঘাটের রক্ষক, খেয়াপারাপার মাঝি)
৮. ডোলাবাহী–ডুলি–বেহারা, বর্তমান দুলিয়া, দুলে।
৯. মল্ল (বর্তমান মালো)

ঘ) জীবনকথা : এই চলকটি দ্বারা সাধারণত বোঝায় চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। দৈনন্দিন আচার-আচরণ, ধর্ম, প্রাত্যহিক কাজকর্ম, সুখ-দুঃখের গল্পগাঁথা। মূলত যা প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দ-বেদনার গল্প। জীবনের সাধারণ কথা। সেখান থেকেই অসাধারণ অনেক কিছু বেরিয়ে আসে।

২.৪ গবেষণার সময়সীমা :

এম.ফিল. গবেষক হিসেবে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছি। আমার গবেষণার সময়সীমা হিসেবে ১২ই ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সময় বেছে নিয়েছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা :

প্রতিটি কাজের পেছনে কোন না কোন সীমাবদ্ধতা থাকে। আমিও আমার এই গবেষণায় নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছি। আমার গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলো হল :

১) বর্তমান গবেষণার অধিকাংশ উত্তরদাতা স্বল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত হওয়ার দরুণ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। ফলে তারা সঠিক তথ্য প্রদানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হননি।

২) দারিদ্রতার কারণে বেশিরভাগ উত্তরদাতা সাহায্য প্রাপ্তির আশা নেই বলে উৎসাহ বোধ করেননি।

৩) গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সাক্ষাৎকারের পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিকূল ছিল।

৪) অনেকক্ষেত্রে তারা আমাকে দেখেছেন সন্দেহের চোখে। তাদের সঙ্গে তাদের মত আচরণ করে মেশার যোগ্যতা আমার তেমন হয়ত ছিলও না। এটি আমার ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে মেনে নিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হরিজনদের পরিচিতি

৩.১ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপট :

সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি অন্যতম ধরণ হচ্ছে–'জাতি বর্ণ প্রথা' যা বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায় না, একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতিবর্ণ প্রথার মত কিছু উপাদান লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মত স্থায়ী রূপে সমাজ কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সেভাবে সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি, যা হয়েছে ভারতে।

ধারণা করা হয় সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কিছুকাল পর ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে। এরপর আর্যরা ভারতে স্থায়ী হয়ে হিন্দুদের বর্তমান মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ প্রণয়ন করতে শুরু করেন এবং মনে করা হয় বেদ রচিত হয়েছে পাঁচশত বছর ধরে। বেদ মূলতঃ বহু রচয়িতাদের রচিত প্রার্থনা সংগীতের একটি সংকলন গ্রন্থ। এই পাঁচশত বছর ধরে যে সমাজ পরিচালিত হয় তাকেই বৈদিক সমাজ বলে এবং জাতি বর্ণ প্রথার শুরু হয় বেদের একেবারে শেষদিকে। বেদের পুরুষ সুক্তের দশম মন্ডলে জাতিবর্ণের কথা উল্লেখ করা হয় এবং ধারণা করা হয় জাতিবর্ণ প্রথা এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে। এর সময়কাল ১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দের কিছু আগে বা পরে। এরপর বেদ আর রচিত হয়নি। ব্রাহ্মণরা বেদ অনুযায়ী অন্যান্য শাস্ত্র রচনা করতে থাকে এবং বৈদিক সমাজ রূপান্তরিত হয় শাস্ত্রীয় সমাজে।

বেদের শেষ দিকে ৪টি বর্ণের কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক বর্ণের জন্য কাজও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রথম বর্ণে ব্রাহ্মণ–যারা ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপত্তি হয় এবং এদের কাজ পূজা-অর্চনা করা, দ্বিতীয় বর্ণে ক্ষত্রিয়–যারা ব্রহ্মার বাহু থেকে এসেছে এবং এদের কাজ যুদ্ধ-বিগ্রহ, তৃতীয় বর্ণে বৈশ্য–যারা এসেছে ব্রহ্মার উরু থেকে এবং এদের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য করা। এরপর চতুর্থ বর্ণে রয়েছে শূদ্র–যারা এসেছে ব্রহ্মার পদযুগল থেকে এবং এদের কাজ সবার সেবা করা। এখানে চতুবর্ণের পেশা ও কাজ জন্মগত এমন কিছুর উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে পেশা ও মর্যাদা এক এক বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং বিয়ষটি জন্মগত রূপ লাভ করে। যাই হোক, জাতিবর্ণ প্রথার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছিল মূলতঃ রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রভাব বিস্তারের চেতনা থেকে। এই জাতিবর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য পর্যায়ক্রমিক অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আর্য ব্রাহ্মণরা এবং তা জাতি প্রথার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। যেমন : স্বজাতি বিবাহ, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

৩.২ পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্ট পুরাণে বর্ণিত কাহিনী এবং মনুর বিধান :

পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্ট পুরাণে বর্ণিত কাহিনী এবং মনুর বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে হরিশংকর জলদাসের নিরীক্ষাধর্মী বই 'রামগোলাম' এর মাঝে। তাঁর ভাষায়, 'মল ও আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য কিছু মানুষকে নিযুক্ত করতেন শাসক সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তেমনি এই ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষেই শুধু এই কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের বিধান ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন যুক্ত হয়েছে। ঈশ্বরীয় বিধানে বলা হয়েছে, সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ এই কাজ করবে। শাস্ত্রকাররা পুরাণের কাহিনীর মোড়কে তাদের অভিসন্ধিকে প্রথাবদ্ধ করেছে। ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা, তাই সব মানুষের পিতাও তিনি। একদিন এই বিশ্বপিতা বনপথে হাঁটছিলেন। হঠাৎ মহর্ষি ব্রহ্মা পথের ঠিক মাঝখানে একদলা গু দেখলেন। গা গুলিয়ে উঠল তাঁর, মন বিষণ্নতায় ভরে গেল। বিষণ্ন ব্রহ্মা বেকায়দায় পড়লেন। পবিত্র দেবতা তিনি। তিনি তো আর নোংরা মল অতিক্রম করতে পারেন না! আবার অনন্ত সময় পথিমধ্যে থেমে থাকাও সম্ভব নয় ব্রহ্মার পক্ষে। কী করা যায়? চিন্তাক্লিষ্ট হলেন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাধানের দ্বার খুলে গেল। তিনি অনেক্ষণ পথ হাঁটছিলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হয়েছেন। রাস্তার ধূলো তাঁর গায়ে লেগে আছে। দেহের চামড়ায় আঙুল ঘষলেন ব্রহ্মা, ঘষায় দেহ থেকে কালো নোংরা কিছু পদার্থ বেরিয়ে এল। আঙুল থেকে পথে পড়ে গেল ওগুলো। ঘামে-ধুলোয় জড়ানো ওই বর্জ্য পদার্থ থেকে জন্ম নিলেন একজন মানুষ। ব্রহ্মা আদেশ দিলেন, মাত্রক, ওই মহী-মাটি থেকে মলগুলো পরিষ্কার করে দে, ওগুলো আমার পথ চলায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। মাত্রক আনতমস্তকে তার স্রষ্টার আদেশ পালন করলেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ঘষে ঘষে পথ থেকে গু-গুলো পরিষ্কার করে দিল সে। ব্রহ্মা খুশি হলেন। বললেন, আজ থেকে তুই মহীধর। ভদ্র মানুষদের মল পরিষ্কার করবি তুই। তাতেই তোর জীবন ধন্য হয়ে উঠবে। ব্রহ্মা পথ দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন তাঁর গন্তব্যে। পথের মাঝে অসহায় মহীধর দাড়িয়ে থাকল ভদ্র-শিক্ষিত মানুষজনের মল পরিষ্কার করার জন্য। ব্রহ্মা প্রজাপতি। মানুষ-প্রকৃতি, পশু-পাখি, নদী-সমুদ্র–সবই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন। তিনি আদি পিতা। তার সৃষ্ট মানুষেরা অমৃতের পুত্র নামে পরিচিত; শুধু মহীধর ছাড়া। না হলে কেন সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা সামান্য মল অতিক্রম করে যেতে পারেন না? পারেন না এই

Dhaka University Institutional Repository

জন্য যে, মল টানার অস্পৃশ্য সন্তানটিকে জন্ম দেয়ার গভীর অভিলাষটি তখন তাঁর ভেতর তোলপাড় করেছে। তাই তো তিনি নোংরা বস্তু থেকে নোংরা সন্তানটির উদ্ভব ঘটালেন। কিন্তু অমৃতের পুত্রদের থেকে এই সন্তানটিকে অভিশপ্ত করে রাখলেন মহর্ষি ব্রহ্মা। এ ব্যাপারে তাঁর ভেতর কোন অনুকম্পা কিংবা উদার স্নেহ জাগল না।' (জলদাস, হরিশংকর, পৃষ্ঠা নং : ২৯-৩০; ২০১২)

প্রকৃতপক্ষে, এই কাহিনী তৈরী করেছিল পুরোহিত সম্প্রদায়। অনুশাসন নির্মাণের প্রবল ক্ষমতা ছিল তাদের হাতে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা মানুষের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করেছিল। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের এতই শক্তি ছিল যে, একসময় সমাজের মানুষরা পুরোহিতের মিথ্যা বাণীকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। মিথ্যা পরাক্রমশালী সত্য হয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নেয়। মল-মূত্র পরিষ্কার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করতে পুরোহিত গোষ্ঠী শাস্ত্রবাণীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন। ধর্মীয় অনুশাসনের যুক্তি মেথর সম্প্রদায়কে হিন্দু জাতিস্তরের সর্বনিম্নস্তরে ঠেলে দিয়েছে। চতুর্বর্ণ বিধান অনুযায়ী হিন্দুধর্মের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান শূদ্রদের। আর শূদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে পাপিষ্ঠ হল মেথররা এবং ঈশ্বরেরই নির্দেশে মল-আবর্জনা টানার কাজটি করতে হবে মেথরদেরকে।

এবার মনুসংহিতা প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হল। মনু ঋষির লেখা বিধানই মনুসংহিতা। মনুসংহিতায় লেখা আছে, 'ছোট জাতদের শহরে বা ভদ্র মানুষদের কাছাকাছি বাস করার অধিকার নেই। তারা থাকবে শহর বা গ্রামের বাইরে। গাছের তলা, শ্মশান, পাহাড় বা বন তাদের বাস করার উপযুক্ত স্থান।'

মনুর বিধানে আরও বলা আছে, 'ব্রাহ্মণের ঘর থাকবে পাঁচটা, ক্ষত্রিয়দের ঘর হবে চারটা। বৈশ্যরা তিনটা ঘর বাঁধতে পারবে। কিন্তু শূদ্রদের ঘরের সংখ্যা হবে দুটো, ইচ্ছে করলে বা সামর্থ থাকলেও দুইটার বেশি ঘরের মালিক তারা হতে পারবে না।'(জলদাস, হরিশংকর, পৃষ্ঠা নং : ৬০; ২০১২)

বর্তমানে মনুর বিধান বিলুপ্ত প্রায় একটি গ্রন্থ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আলোকে বলা চলে এই বিধান একেবারেই অচল। কিন্তু খুবই অদ্ভুত যে হরিজনদের জন্য কলোনী বানানোর সময় সিটি কর্পোরেশন মনুর বিধান মাথা পেতে নিয়েছেন। মনুর লিখে যাওয়া নিয়ম মেনে হরিজনদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য দুটি করে ঘরই বরাদ্দ করেছেন। একটি শোবার ঘর, আরেকটি ছোট্ট রান্নাঘর ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ শ্রমন সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি :

ভারতীয় উপমহাদেশে বহুকাল যাবত দুটো সাংস্কৃতিক ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। তার একটি হল শ্রমন সংস্কৃতি, অন্যটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। শ্রমন সংস্কৃতি উপমহাদেশের আদি সনাতন মৌলিক সংস্কৃতি, যা উপমহাদেশীয়। প্রাচীন সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যা আর্যদের সাথে বাইরে থেকে এসেছে। এ দুটি সংস্কৃতির মধ্যে আকাশ জমিন পার্থক্য। কেননা শ্রমন সংস্কৃতি অন্তর্মূখি, আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহির্মূখী। মানুষের সমমর্যাদা, সমানধিকার, ভ্রাতৃত্ববোধ, নিরপেক্ষতা, ন্যায় ও সত্য চর্চার সমন্বিত রূপের অনুশীলন ও প্রয়োগই শ্রমন সংস্কৃতি। আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে জাতিভেদ, বর্ণভেদ অধিকার, শাসক-শোষকের ভূমিকারই প্রাধান্য। কারণ শ্রমন সংস্কৃতি নিবৃত্তি প্রধান, যেখানে ত্যাগই বড় কথা। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবৃত্তি প্রধান যেখানে ভোগ-বিলাসই প্রধান।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর্যরাই এ উপমহাদেশে নিয়ে এসেছিল যা পন্ডিতবর্গের মতানুসারে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছরের অধিক পুরনো নয়। শাসক ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে আর্যরা শ্রমন সংস্কৃতিকে কোনঠাসা করে রেখেছিল। আর্য ব্যবস্থাপকেরা জনতাকে দাসে পরিণত করার জন্য চতুবর্ণ বিধান রচনা করল। এই অবস্থায় শোষিত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষ হারিয়ে যাওয়া শ্রমন সংস্কৃতির মধ্যেই তাদের মুক্তির দিশা খুঁজে পেল। এসময় উপমহাদেশে আর্বিভূত হলেন দুই মহাপুরুষ। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। দুই মহাপুরুষই সুপ্রাচীন শ্রমন সংস্কৃতি তথা সনাতন সত্ত ধর্মকে নতুনভাবে পরিমার্জিত রূপে উপস্থাপন করলেন। সমাজে অহিংস, সত্য, সমতা, শান্তি স্থাপিত হল। কিন্তু শ্রমন সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের ফলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ঐতিহাসিক কাহিনী মতে, সম্রাট অশোকের নাতির ছেলে খুব অল্প বয়স্ক পুত্র বৃহদ্রথকে রেখে অকালে মারা যান। তার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ, যিনি ছিলেন একজন আর্য্য ব্রাহ্মণ্য, তিনি শিশুপুত্র বৃহদ্রথের হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। একদিন পুষ্যমিত্র সুঙ্গ রাজদরবারে সকলের সামনে বৃহদ্রথের শিরচ্ছেদ করেন এবং নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রাজধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ফলে মূলনিবাসী যারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের উপর নেমে এল অত্যাচারের খড়গ। শাস্ত্রীয় বিধানের নামে মানুষের উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ, জীবন-মরণ, গর্ভধারণ, জন্ম অর্থ্যাৎ জীবনের নানা ক্রিয়ার উপর ধর্মীয় আইন বাস্তবায়ন করা হয়। যা সাধারণ মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। ব্রাহ্মণ্যবাদের জাত-বর্ণের যাতাকলে

Dhaka University Institutional Repository

পিষ্ট শান্তিকামী মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। নিজ দেশে নিজ ধর্মে তারা পরবাসী হয়ে যায়। এ অবস্থায় শ্রমন সংস্কৃতি তথা সন্তধর্মের পুনর্জাগরণে পাঁচজন ভক্তিবাদী ও মানবতাবাদী মহাত্মার আগমণ ঘটে। তারা হলেন সন্তগুরু রবিদাসজী মহারাজ, সন্তগুরু কবিরজী, সন্তগুরু নানকজী, গুরু দাদু দয়ালজী ও চৈতন্য মহাপ্রভু।

এই বিপ্লবী মহাপুরুষগণ, ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অধিকারভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় নাম পাওয়া যায় পথপ্রদর্শক জ্যোতিরাও ফুলে, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পেরিয়ার রামস্বামী, স্বামী শিবনারায়ণ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের। এই সমাজ সংস্কারগণ বিশ্বাস করতেন বেদ ঈশ্বর সৃষ্ট নয়। বেদ মানুষেরই রচিত। বেদই সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তাদেরই উত্তরসূরী আরেকজন সার্থক অনুগামী মহাবিপ্লবী বাবা সাহেব ড. ভিমরাও আম্বেদকার। আম্বেদকারের নাম উপমহাদেশের দলিত বঞ্চিত জনগণের কাছে একটি মুক্তিমন্ত্র। তাদের কাছে তিনি কেবলমাত্র ভারতের সংবিধান প্রণেতা এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষী মাত্র নন। তিনি উপমহাদেশের কোটি কোটি লাঞ্ছিত, দলিত ও মানবিক অধিকারহীন জনগণের মুক্তিদাতা। সারা বিশ্বে মানবাধিকার যোদ্ধা নামে পরিচিত। একটা সময় তিনি ভারতবর্ষে জল-অচল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের জল-অচল সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত নিচু জাতের। যাদব ঠাকুরদের পুকুর বা কুয়ার জল স্পর্শ করার কোন অধিকার ছিল না জল-অচল জাতের। ফলে জল স্পর্শ করার অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আম্বেদকার। এতসব মানবতাবাদী কাজের জন্য আম্বেদরকারকে তুলনা করা হয় স্পার্টাকাস ও সক্রেটিসের সঙ্গে। দীর্ঘ সময় একাই লড়াই করে গেছেন তিনি। মননশীল রাজনৈতিক সাহিত্যেও তার অবদান ব্যাপক। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে যেমন : শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা বা মহাদেব অত্যন্ত সম্মানের ঠিক তেমনি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে আম্বেদকার পরম পূজনীয়।

৩.৪ গণকটুলীর হরিজনদের পেশার ইতিহাস :

হরিজনদের পেশার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে সত্যেন সেনের 'শহরের ইতিকথা' বইটি থেকে জানা যায়, ১৯২০ সালে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সংগ্রহের জন্য দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারতের কানপুর ও প্রাক্তন মাদ্রাজ (বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশ)। তারা ছিল তেলেগু ও হিন্দী ভাষী। তাছাড়া এলাহাবাদ, চারগাঁও প্রভৃতি জায়গা থেকেও এদের সংগ্রহ করে আনা হত। উল্লেখ্য, ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের

Dhaka University Institutional Repository

বিশাখাপত্তম থেকে অনেক তেলেগু হরিজন এবং উত্তর প্রদেশে অবস্থিত কানপুরের হামিরবাগ থেকেও অনেক হিন্দীভাষী হরিজন এদেশে নিয়ে আসা হয়। (সেন, সত্যেন, ১৯৭৪)

তেলেগু আর হিন্দীভাষী হরিজন সম্প্রদায়টি পূর্ববঙ্গে এসে সাংস্কৃতিক সংকটে যেমন পড়েছে তেমনি পড়েছে ভাষা সংকটে। কাশ্যপ বর্ণের সনাতনধর্মী এই মানুষরা শুধু দু'বেলা পেটের খাবার জোগাড় করার জন্য নিদারুণ অবহেলা আর অপমান সয়ে গেছে বছরের পর বছর ধরে।

পরবর্তীতে ১৯৪০ এর দশকে যুদ্ধ, অভাব, দেশভাগের কারণে দেশীয় বাঙালী লোকজন হালকা ধরনের পরিচ্ছন্নতার কাজে আসেন। ১৯৪৩ সালে অসংখ্য বাঙালী মুসলিম অফিস-আদালত পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত হন। ১৯৭৪ সালে বন্যা পরবর্তী দুর্ভিক্ষের কারণে আরো বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী এ পেশায় নিয়োজিত হন।

হরিজনদের পেশার ইতিহাস জানতে পারি গণকটুলী সুইপার কলোনীর বৃদ্ধ হরিজনদের সাথে কথা বলে যারা বংশ পরম্পরায় এই ঘেরাটোপের মধ্যে বসবাস করছেন।

ঝাড়ুদারি হরিজনদের আদি পেশা। সেই সূত্রে তারা নিজেদেরকে জাত সুইপার বলে দাবী করেন। কিন্তু কিভাবে হরিজনরা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেন, সেটি একটি যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাস। তাদেরকে জোর করে এ পেশায় নামানো হয়েছে। আদিতে তারা সুইপার ছিলেন না। ব্রিটিশরা তখন ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করতেন। ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণের ও বর্ণাশ্রম বহির্ভূত মানুষগুলোর তখন অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটছিল। ব্রিটিশ কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টরগণ তখন ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের ডেকে এনে এই কথা বলেন যে, তাদের ভাল কাজ দেওয়া হবে। তারা হরিজনদের আরও প্রলোভন দেন যে, ভাল চাকুরীর পাশাপাশি অসুস্থ হলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেয়া হবে, থাকার ঘর দেয়া হবে, অনেক সুবিধা দেয়া হবে। এই প্রস্তাবে তখন নিম্নবর্ণের বেশ কিছু হিন্দু সাড়া দেন এবং এলাকা ছেড়ে চলে এসে সরকারী চাকুরী নেন। সরকার তখন তাদেরকে দূর দূরান্তের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে চাকুরী, থাকার ঘর, চিকিৎসা সবকিছুই দেয়া হয় কিন্তু তাদের বলা হয় মলমূত্র ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে, অফিস ও রাস্তাঘাট ঝাড়ু দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

হরিজনরা এসব কাজ করতে রাজি না হলে তাদের ওপর শুরু হয় নানা অত্যাচার ও নির্যাতন। তারা তখন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনেন এবং কাজ দেয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে তা না দেয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। নানা নির্যাতন ও মারধরেও হরিজনরা ঝাড়ুদারের কাজ করতে রাজি না হলে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের লোকেরা একটি জরুরী বৈঠকে বসেন। পরবর্তী সময়ে জানা গেছে, ওই বৈঠকে একটি গোপন সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তটি হল যেভাবেই হোক, হরিজনদের একটি অংশকে কাজ করতে রাজি করাতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দোলনরত হরিজনদের মধ্য থেকে কিছু লোককে ডেকে নিয়ে সরকার তাদেরকে নানাভাবে হাত করার চেষ্টা করে, বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখায়। কৌশলে কিছু সংখ্যক হরিজন নেতাকে হাত করে নিতেও সক্ষম হয় সরকার। প্রবীণ হরিজনরা বলেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিদিনই ওই লোভী হরিজন নেতাদের মদের বোতল দিয়ে মদ্যপানে আসক্তি করে তোলে। আর মাতাল অবস্থায় ওইসব হরিজনদের কাজ থেকে তারা কাজ আদায় করিয়ে নেয়। এভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন। ওই হরিজন নেতারা তখন তাদের গোত্রের অন্যদের ঝাড়ুদারি পেশায় যোগ দিয়ে সরকারের দেয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে বলেন। এভাবে ব্রিটিশের দেয়া ঝাড়ুদারি চাকুরীতে হরিজনদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে হরিজনরাও নিজেদেরকে ঝাড়ুদারি পেশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে থাকেন। এক পর্যায়ে ঝাড়ুদারি পেশাই হয়ে যায় হরিজনদের জীবন ও জীবিকার মূল পেশা। ফলে ব্রিটিশরা যখন উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, তখনও হরিজনরা ওই পেশাতে রয়ে যায়। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান নামে যখন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়, হরিজনরা তখনও ওই ঝাড়ুদারি পেশাকেই আকড়ে ধরে থাকেন। আর পাকিস্তান ভাগ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে হরিজনরা ঝাড়ুদারি পেশাকে তাদের আদি জাত পেশা হিসেবে ঘোষণা করেন। এখনও এ পেশাকে আকড়ে ধরেই তাদের অধিকাংশের জীবন চলে।

হরিজনদের ঝাড়ুদারি পেশার বাইরে অন্যান্য কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মর্গে লাশ কাটা, জুতা সেলাই করা, শ্মশানে লাশ দাহের কাজ করা, নারী হরিজনদের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে মালিশওয়ালীর কাজ করা ইত্যাদি। হরিজনদের পেশাগত পার্থক্য নির্ধারিত হয় মূলত অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বিভক্তি বা ভাগ অনুযায়ী। তবে গণকটুলী সুইপার কলোনীর বেশিরভাগ হরিজনই মলমূত্র পরিষ্কার ও ঝাড়ুদারি পেশার সঙ্গে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

গণকটুলী সুইপার কলোনীতে যে সকল হরিজন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে জড়িত তাদের একটি বড় কর্মক্ষেত্র হল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিভিন্ন কলেজ, অফিস আদালত ইত্যাদি। তাছাড়া তারা বাসাবাড়ি পরিষ্কার করার কাজও করে থাকেন। বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সুবল চন্দ্র দাস জানান, 'সরকারী বেসরকারী সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই সাধারণত একটি ঝাড়ুদার পদ থাকে। সেগুলোতে কাজ করেন বহু হরিজন।' সময়ের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সাথে সাথে এদেশের বহু মানুষ তাদের পেশা বদল করলেও হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন এখনও তাদের আদিম পেশা ছাড়তে পারেননি। তারা এ পেশা আর ছাড়তেও চান না। হরিজনদের মতে, 'এটি তাদের আদি ও জাত পেশা। তাদের পূর্বপুরুষ এ পেশা থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে গেছেন। সুতরাং তারাও এই পেশাতেই জীবিকা নির্বাহ করতে চান।'

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বসতি এলাকা ও পরিবেশ

৪.১ সমাজে অস্পৃশ্য হরিজনরা :

হরিজনরা এদেশের নাগরিক এবং সাংবিধানিক সুবিধার দাবীদার। একজন নাগরিক এদেশে যে সকল নাগরিকঅধিকার ভোগ করেন একজন হরিজনেরও সেসকল অধিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা সংবিধানে সংরক্ষিত। কিন্তু সংবিধানে রক্ষিত সেই নিশ্চয়তার প্রতিফলন বাস্তবে নেই। ব্রিটিশ আমলে হরিজনরা যে অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন, এখনও ঠিক তাই আছেন।

সভ্যতার ক্রম অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে তারা এগুতে পারেননি। সমাজে তাদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সবকিছু এখনও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছে করলেই তারা কোথাও গিয়ে খেতে পারেন না, বসতে পারেন না। অস্পৃশ্য বলে সকলে তাদের দূর দূর করে ঠেলে দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর অনুসারী এই হরিজনদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের মত একই দেবদেবীর আরাধনা করলেও সব মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার হরিজনদের নেই।

এদেশের হরিজনদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইনগত কোন ব্যাখ্যা কারও কাছে নেই। কেননা এদেশের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের ২৭ নং ধারায় বলা আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' আর সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৯(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।' আবার ১৯(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমানস্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, হরিজনদেরকে তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন আইনগত ভিত্তি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সুবল চন্দ্র দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'কোন জনগোষ্ঠী নোংরা হয়ে চলাফেরা করলে, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করলে অথবা ময়লা পোশাক পড়লে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় না। অথচ হরিজনদের বেলায় সেটাই ভাবা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'হরিজনরা সমাজেরই অংশ। অন্য সম্প্রদায়ের আর দশজন মানুষের মত স্বাভাবিক চলাফেরা করে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তারা রাষ্ট্রীয় অনেক সুযোগ সুবিধা থেকেই বঞ্চিত।'

হরিজনরা যে অস্পৃশ্য নয়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই সেকথা মানতে নারাজ। তারা মনে করেন, হরিজনরা যখন যা স্পর্শ করেন সাথে সাথেই তা শুদ্ধতা হারায়। তাই তাদের সঙ্গে বসা যায় না, খাওয়া যায় না, তাদেরকে ছোঁয়া যায় না। আর এক্ষেত্রে সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে যায় হরিজনদের ওপর। তাদেরকেই অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকতে হয়। সবকিছু দেখে শুনে এমনভাবে চলতে হয় যেন অন্যদের 'পবিত্রতা' নষ্ট না হয়। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার হরিজনদের নেই। অথচ আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের ৩৬নং ধারায় বলা হয়েছে, 'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেলা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।' কিন্তু হরিজনদের বেলায় এ বিধানের কার্যকারিতা নেই।

গণকটুলীর হরিজন কলোনীতে বসবাসকারী রাজিব রবিদাস জানান, 'যেসব জায়গায় গণমানুষের অবাধ যাতায়াত সেখানেও তারা যেতে পারেন না। ক্ষুধায় পেট জ্বলতে শুরু করলেও হুট করে কোন হোটেলে বসে কিছু খেতে পারেন না। সামাজিকভাবে তাদের ওপর এসব বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা নিচু জাতের মানুষ। তাই হোটেলে আমাদেরকে বসতে দেয়া হয় না। কিছু খেতে হলে হোটেলের বাইরে দাড়িয়ে খেতে হয়।' হোটেলের থালা বাসন হরিজনদের ব্যবহারের জন্য নয়। তাই এক কাপ চা খেতে হলেও কাপ সাথে করে নিয়ে যেতে হয়। দোকানের বাইরে দাড়িয়ে কাপ বাড়িয়ে দিতে হয় চায়ের জন্য। আক্ষেপ করে রাজিব রবিদাস বলেন, 'এ সমাজে আমরা এতই ঘৃণিত যে সবখানে বসার অনুমতিও আমাদের নেই। পরিচয় জানলে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন আমাদের তাড়িয়ে দেয়।'

Dhaka University Institutional Repository

হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস জানান, 'কিছুদিন আগে গণকটুলী হরিজন কলোনীর একটি ছেলে আজিমপুরের একটি হোটেলে খেতে বসেছিল, সেখানে এক লোক তাকে চিনে ফেললে হোটেলে তাকে খাবার না দিয়ে উঠে চলে যেতে বলা হয়। হোটেলের টেবিল চেয়ার ব্যবহারের অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'শুধু হোটেলে ঢুকতে না দেয়া নয়, অনেক জায়গায় নাপিতরা হরিজনদের চুলও কাটে না। গাইবান্ধার একটি হোটেলে বানর সাথে নিয়ে এক লোককে খেতে দেখেছি। অথচ ওই মুহূর্তে সেই হোটেলে আমাকে বসতে দেয়া হয়নি। সুইপার বলে হোটেলের লোকজন বাইরে দাড় করিয়ে আমাকে খেতে দিয়েছে।' ক্ষোভের সাথে নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, 'বানর সাথে নিয়ে খেতে এ সমাজের মানুষের সমস্যা হয় না। সমস্যা হয় শুধু হরিজনদের পাশে বসতে। সমাজে সবাই আমাদের হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়; কিন্তু পরিষ্কার হওয়ার পর আমাদের আর মানুষ মনে করে না। পশুর চেয়েও আমাদের বেশি ঘৃণা করে।'

গবেষণার অংশ হিসেবে আজিমপুর, নীলক্ষেত ও নিউ মার্কেটের কয়েকটি দোকানে হরিজনদের প্রসঙ্গে কথা হয়। হরিজনদের খাবারের দোকানে ঢুকতে না দেয়ার কারণ সম্পর্কে নিউ মার্কেটের একটি স্ন্যাক্সের দোকানের কর্মচারী সালাম মিয়া বলেন, 'হরিজনরা হোটেলে বসলে আর কেউ হোটেলে ঢুকতে চায় না। হরিজনদের পাশে বসিয়ে খেতে দিলে কেউই আর কোনদিন ওই হোটেলে খেতে আসবে না। আর লোকজন না এলে আমাদের ব্যবসা চলবে না। সে কারণেই হরিজনদের হোটেলের ভেতরে ঢুকতে বা বসতে দেয়া হয় না।' তবে থালা-বাসন নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে তারা যা কিনতে চায় তাই দেয়া হয় বলে জানান তিনি। পুরনো ঢাকার হোটেল ব্যবসায়ী রফিক মিয়া জানান, তার দোকানে সুইপারদের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, 'সুইপাররা নিচু জাত। ওদের স্পর্শে জিনিসপত্রের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। আর সুইপাররা যে হোটেলে বসেন সেখানে কোন ভদ্রলোক যাননা।'

শুধু হোটেল রেস্তোরা নয় অনেক জায়গায় হরিজনরা হিন্দু-মুসলিম কারও বাড়িতেই অনুমতি ছাড়া ঢুকতে পারেন না। গণকটুলীর কলোনীগুলোতে Focus Group Discussion (FGD) এর সময় জানা যায়, নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার কারণে এটি হরিজনদের প্রতি আরেক ধরনের সামাজিক বৈষম্য। তবে এ অবস্থা শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশি দেখা যায়। জানা যায়, গ্রামাঞ্চলে হরিজনরা কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তার বাড়ির সামনে গিয়ে অপেক্ষা করেন। অনুমতি ছাড়া তিনি ভেতরে

Dhaka University Institutional Repository

ঢুকতে পারেন না। নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, 'এমন পরিস্থিতি এখন অনেকটা শিথিল হয়েছে। তবে পুরোপুরি এখনো উঠে যায়নি।' তিনি আরও বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন আমরা কারও বাড়িতে গিয়ে বসতে পারতাম না। বাড়িতে গেলেও ঘরের ভেতর ঢোকার অনুমতি ছিল না। হাট-বাজারে ঢোকাও আমাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। সেই অবস্থার এখন পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এখন অনেকের বাড়িতে যেতে পারছি, বসতে পারছি। তবে সবাই আমাদেরকে সমান চোখে দেখে না। অনেকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। এ ধরনের আচরণ খুব কষ্ট দিলেও করার কিছুই নেই।'

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সদস্য সুবল চন্দ্র দাসের বাসায় গেলে তাঁর মেয়ে চন্দ্রিমার সাথে কথা হয়। তিনি বলেন, 'সমাজে আমাদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হয় তেমন আচরণ আর কারও সঙ্গেই করা হয় না। হরিজন বলে আমাদেরকে এখনো অনেক জায়গায় থালার বদলে কলাপাতায় খেতে দেওয়া হয়। যে পিঁড়িতে বসতে দেয় সেটিও পরে তারা আমাদের কাছে ধুয়ে নেয়।' তিনি আরও বলেন, 'ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করি বলেই সমাজে আমরা অস্পৃশ্য, অচ্ছুত। কিন্তু এর কোন কারণ আমরা খুঁজে পাই না। অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন কেন আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করে তাও আমরা বুঝি না। কেননা, ময়লা পরিষ্কারের কাজ করি বলে আমরা সবসময় ময়লা গায়ে মেখে বা নোংরা হয়ে থাকি না। সমাজে চলতে হলে কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হয়, আমরা তা বুঝি। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই শিক্ষিত। স্কুল, কলেজে লেখাপড়া করে অনেকে। আর যারা লেখাপড়া করে, তাদের মধ্যে অনেকে ঝাড়ুদারি পেশার সঙ্গেই জড়িত নয়। তাদের প্রতিও তো সমাজে একই ধরনের আচরণ করা হয়। তা হলে এর পেছনে কারণ কি?'

সুবল চন্দ্র দাস বলেন, 'শুধু ময়লা পরিষ্কার করে বলেই হরিজনদের অচ্ছুত ভাবা হয়–একথা ঠিক নয়। মূল কারণ অন্য জায়গায়। হরিজনরা সমাজে অস্পৃশ্য সেই আদিকাল থেকেই। বিষয়টি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আইনগত বা ধর্মীয় কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও মানুষ এখনও তাদের অস্পৃশ্য মনে করেন। এটি সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির। তবে পেশাগত কারণ যে এর পেছনে কাজ করে না তা নয়। অবশ্যই সেটিও একটি কারণ। তিনি আরও বলেন, 'সমাজটাই এমন হয়ে গেছে যে আমরা মেথরের জাত বলে আমাদের কোন রুচি থাকতে পারে না, ঘৃণা ভালবাসাও থাকতে পারে না, বেঁচে থাকাটাই আমাদের কাছে ভাল থাকা।'

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, 'এখন হরিজনরা আগের চেয়ে অনেক আধুনিক। তারা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। কিন্তু বিশ বছর আগেও এমন অবস্থা ছিল না। তখন হরিজন কলোনীগুলোতে ঢোকা যেত না দুর্গন্ধের কারণে। ময়লা আবর্জনার মধ্যে হরিজনরা বসবাস করতেন। প্রায় প্রত্যেকেই বাড়িতে শূকর রাখতেন, মদ পান করে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতেন। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেন। এভাবেই হরিজনদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের দূরত্ব দিন দিন বেড়েছে।' তিনি একথাও বলেন যে, 'হরিজনরা অনেকেই এখন মদ্যপান করেন না। শূকর পোষাও আগের চেয়ে কমে গেছে। তারা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য ও আধুনিক। কিন্তু তারপরও সমাজে তাদের প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব তা দূর হচ্ছে না।'

গবেষক হিসেবে গণকটুলীর হরিজন কলোনীগুলোতে গিয়ে অবশ্য কলোনীগুলো খুব অপরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তবে শূকর পালন ও মদ কেনা-বেচার প্রবণতা আগের তুলনায় অনেক কমেছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

Focus Group Discussion এ মহিলাদের কাছ থেকে কিছু সুন্দর কথা বেরিয়ে এসেছে। হরিজনদের দাবী, 'তারা মায়ের জাত। মা যেমন তার সন্তানকে সব সময় ধুয়ে-মুছে, পরিষ্কার করে কোলে তুলে রাখেন; হরিজনরাও ঠিক তেমনি দেশকে, দেশের মানুষকে সন্তানের মতোই সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। সন্তানের কাছে মা যেমন কখনও অস্পৃশ্য বা অচ্ছুত হন না; তেমনি হরিজনরাও কখনও অস্পৃশ্য হতে পারেন না।'

গণকটুলী হরিজন কলোনীর বাবু চন্দ্র হাড়ি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা ময়লা পরিষ্কার করলেও সবসময় অপরিষ্কার থাকি না। অথচ আমাদের দেখলেই সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সব জায়গা থেকেই যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে আমরা যাবো কোথায়? কোথায় গিয়ে কাজ করবো? আমাদের জীবন বাঁচবে কেমন করে?' তার অভিযোগ, 'এদেশে হিন্দু-মুসলিম কেউই এসব কথা ভাবেন না। যদি ভাবতেন তবে হরিজনদের অস্পৃশ্য বলে তারা দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন না।'

Dhaka University Institutional Repository

গণকটুলী হরিজন কলোনীর বাসিন্দা মালা রাণী দাস। সরকারী অফিসে বিগত দশ বছর ধরে ঝাড়ুদারের কাজ করছেন তিনি। অস্পৃশ্যতার বিষয়টিকে তিনি দেখেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। তিনি মনে করেন, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সমাজে টিকে থাকতে হবে। পেশাগত উত্তরাধিকার ধরে রাখতে হবে। তার মতে, 'মানুষ আমাদের যতই ঘৃণা করুক; হঠাৎ করে আমরা এ পেশা ছেড়ে দিতে পারব না। কেননা, ঝাড়ুদারি পেশা ছেড়ে আমাদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই। এই পেশা ছাড়লে আমাদেরকে না খেয়ে মরতে হবে। সমাজে আমরা এখনও মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত। তাই হঠাৎ করে ঝাড়ুদারি পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

গণকটুলীতে সরজমিনে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, কলোনীগুলোতে উপরে ওঠার একটি মাত্র সিঁড়ি। সিঁড়ির দুদিকে ঘরগুলোর অবস্থান। ঘরগুলোর সামনে দিয়ে চিকন লম্বা বারান্দা চলে গেছে। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ঘরগুলোর ভেতরে দেখতে পাওয়া যায়। পর্দার বালাই নেই প্রায় কোন ঘরেই। জানালা নেই বললেই চলে। আলো-বাতাসের জন্য সকাল থেকে প্রতিটি ঘরের সামনের দরজা খুলে রাখা হয়। ঘরের ভেতরের আব্রু বলে কিছু নেই হরিজন কলোনীগুলোতে। সবাই সবার হাড়ির খবর জানে। প্রতিটি ঘরেই জীর্ণ বিছানা, রংহীন থালা-বাসন, ছালতোলা মেঝে, পলেস্তারা খসানো দেয়াল চোখে পড়ে।

সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। হরিজন সমাজের সামগ্রিক দেখভাল ও বিচারকার্যের জন্য সর্দার ব্যবস্থা থাকলেও এখন আর তা তেমন ভাবে মানা হয় না। হরিজন সমাজে প্রচলিত সর্দার, মুখ্য ইত্যাদি পদগুলো কালের বিবর্তনে যেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, ওইসব কলোনীগুলো শুরু থেকেই যেন একেকটি বিচ্ছিন্ন এলাকা। গণকটুলীর ঘন লোকবসতির মধ্যে হরিজন কলোনীগুলোর অবস্থান। কিন্তু সেখানেও যেন সবকিছু থেকে কলোনীগুলো বিচ্ছিন্ন। হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনদের সেখানে তেমন যাওয়া আসা করতে দেখা যায় না। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ সেখানে যান না। কলোনীর বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন না। হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাসের মতে, 'ব্রিটিশ সরকার এদেশের হরিজনদেরকে পৃথক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতেই ওই ব্যবস্থা করেছেন। ভদ্রসমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অথচ প্রয়োজনে যেন কাছে পাওয়া যায় এমন জায়গায়। মূলত,

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ আমলে সরকার হরিজনদের ব্যাপারে যেসব মিশন হাতে নিয়েছিল তার সবগুলোই সফল হয়েছে। ব্রিটিশরা এদেশের হরিজনদের সেই যে ঘেরাটোপে (কলোনীগুলোতে) ঢুকিয়ে গেছেন আজ পর্যন্ত তারা সেই ঘেরাটোপ থেকে বের হতে পারেননি। গাদাগাদি করে ঘিঞ্জি পরিবেশে বসবাস করতে হচ্ছে।'

৪.২ ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন :

গণকটুলীর হরিজন কলোনীগুলোতে গিয়ে দেখা গেছে ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন হরিজনরা। আবাসন সঙ্কট তাদের জন্য একটি অন্যতম সমস্যা। দিনের পর দিন তাদের কেটে যাচ্ছে সুইপার কলোনীর নোংরা পরিবেশে। কলোনীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে উঠছে শিশুরা। কিন্তু করার কিছু নেই। হরিজনরা সেই ঘিঞ্জি পরিবেশের সাথেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

গণকটুলী হরিজন কলোনীগুলোতে বসবাসরত প্রত্যেক পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ১০ জন। সরকার তাদের থাকবার জন্য পরিবার প্রতি ১০ বর্গফুটের একটি করে ঘর দিয়েছে। সাথে লাগোয়া ছোট্ট একটি রান্না ঘর।

ওই ১০ বর্গফুটের ঘরেই গাদাগাদি করে থাকেন একেকটি পরিবার। অনেক ক্ষেত্রে ওই এক ঘরেই বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, ছেলের-বৌ, নাতি-নাতনি সবাই এক সাথে ঘুমান। এভাবেই তাদের জীবন চলে। ছেলে বিয়ে করালে অনেক সময় বাবা-মাকে রান্না ঘরে ঢুকে পড়তে হয়। অথবা বারান্দায় খাটিয়া পাততে হয়। তাদের মানুষ বাড়ে, ঘর বাড়ে না। কলোনীর বিল্ডিং ছাড়াও অসংখ্য টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর দেখতে পাওয়া যায়। ওই ঘরগুলোর বেশিরভাগেরই দেয়াল খসে পড়েছে। অথচ মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। কলোনীগুলোরও জীর্ণ দশা। বসবাসরত হরিজনরা বলেন, 'পুরনো বাড়িগুলো আর মেরামতের উপযোগী অবস্থায় নেই। মেরামত করতে গেলেই সব একসাথে ভেঙ্গে পড়বে।' বেশির ভাগ পরিবারেরই নিজস্ব টয়লেট নেই। কলোনীগুলোতে প্রায় সাড়ে তিনশ পরিবারের জন্য গড়ে একটি টয়লেট দেখতে পাওয়া যায়। অনেক পরিবার নিচ খরচায় ঘরের মাঝে টয়লেট বানিয়ে নিয়েছে যেটি বর্তমান আবাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া শান্তিবালার মতে, 'এখানকার অনেক পরিবার নিজেরাই ঝুপড়ি ঘর তৈরী করেছে। সেখানে ১০ থেকে ১২ জন পর্যন্ত ঘুমায়। রাতের বেলা প্রত্যেক ঘরে গাদাগাদি করে মানুষ শুয়ে থাকে। দিনের বেলা কাজে যায়। গণকটুলীর ১০ বর্গফুটের ঘরগুলোর অনেকগুলোতে বয়স্করা সবাই বারান্দায় ঘুমান। আর ছেলে-মেয়ে ও বউরা ঘুমান ঘরের মধ্যে। তাও সবার একসঙ্গে ঘুমানোর সুযোগ হয় না। তারা ঘুমান পালা করে।'

কলোনীর বাসিন্দা স্বপ্না রাণী দাস বলেন, 'আমাদের জীবন মানুষের জীবন নয়। আমাদের জাত যেমন তুচ্ছ, আমাদের জীবনও তেমনি তুচ্ছ। সবাই আমাদের দেখে ছিঃ ছিঃ করে আর তাড়িয়ে দেয়। দেশে সবার সমস্যা দেখার মানুষ আছে; শুধু হরিজনদের সমস্যা দেখার কেউ নেই।' তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু সমাজে আমরা অচ্ছুত। আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা, আমাদের ছায়া মাড়ালেও হিন্দুরা, বামুনরা অপবিত্র হয়ে যায়। তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও আমাদের ঘেন্না করে, মানুষ ভাবে না।'

কলোনীর বাসিন্দা মানিক চন্দ্র পেশায় ঝাড়ুদার। তিনি বলেন, 'কলোনীর অনেক বাসিন্দাই দারিদ্রের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের খেতে দিতে পারেন না। খেতে দিতে না পারায় অনেকের সংসার ভেঙে যাচ্ছে। অনেকে বিয়ে করে বৌ আনতে পারছেন না নিজের থাকার ঘর নেই বলে। স্ত্রীকে চিরদিনের মতো শ্বশুরবাড়িতে রেখে দিচ্ছেন।'

খুপড়ি ঘরগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সেখানকার বসবাসরত বাসিন্দারা জানান, 'শুধুমাত্র সরকারী অফিসে ঝাড়ুদারের চাকুরী যারা করেন, কেবল তারাই একটি করে ঘর বরাদ্দ পেয়েছেন। আর যারা সরকারি চাকুরী করে না তাদেরকে সরকার কোন ঘর দেয়নি। তাই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে হরিজনরা নিজেদের অর্থে ছোট ছোট ঘর তৈরী করে পরিবার পরিজনকে নিয়ে থাকছেন।'

আবাসন সঙ্কট প্রসঙ্গে বসবাসরত হরিজন শিবু মন্ডল বলেন, 'আমরা এদেশের নাগরিক। আমাদের ভোটাধিকার রয়েছে। অথচ তারপরও আমরা এদেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারছি না। আমাদের ছেলে-মেয়েরদেরকে রাতে ঘুমানোর জায়গা দিতে পারি না। তারপরও কলোনীর বাইরে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে বাড়ি করা আমাদের জন্য নিষেধ। চোখ বুজে পশুর মত জীবন কাটাই আমরা।' দেশের প্রচলিত আইন হরিজনদের বেলায় কাজ করেনা বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

গত বিশ বছরে হরিজন কলোনীগুলোতে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও আয়তন বাড়েনি একটুও। উল্লেখ্য, ড্রেনগুলোর কোন ঢাকনা নেই। ড্রেনের মধ্যে ময়লা জমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া ড্রেন দিয়ে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও এখন আর তেমন ভাল নয়। প্রতিটি পরিবারই তাদের রান্নার কাজ করে ওই খোলা ড্রেনের পাশে। অনেকে খাওয়ার কাজটিও করেন ওই ড্রেনের পাশে বসেই। তাদের মতে, 'যেখানে থাকার জায়গা হয় না, সেখানে রান্নার জন্য আলাদা ঘর আশা করা যায় না।'

কলোনীতে বসবাসরত কৃষ্ণা হরিজন জানান, তারা বাবা-মা, ভাই-বোন ও কাকা-কাকি মিলে এক সঙ্গেই থাকেন। সবমিলে তাদের এই যৌথ পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৩৫। অথচ তাদের থাকার জন্য রয়েছে ১০ বর্গফুটের মাত্র দুটি ঘর। তিনি বলেন, 'যদিও শীত বা গরমের দিনে এখানে সেখানে গিয়ে ঘুমানো যায়; কিন্তু অসুবিধা হয় বর্ষকালে। বৃষ্টি-বাদলে অনেক সময় সবাইকে বসে রাত কাটাতে হয়।' কৃষ্ণার ভাই শঙ্কর বলেন, 'নির্ঘুম রাত কাটানোর পরও সকালে উঠে ঝাড়ু হাতে তাদের ছুটতে হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে।' তার স্ত্রী পারুল বালা জানান, 'তাদের এই বৃহৎ যৌথ পরিবারের জন্য কোন আলাদা ল্যাট্রিন নেই। ল্যাট্রিন ব্যবহারের দরকার হলে অনেকেই ছুটে যান খোলা জায়গায়।' শঙ্কর জানান, 'তার বাবা ও কাকার নামে বরাদ্দ হয়েছিল ওই দু'টি ঘর। তখন তাদের পরিবারে সদস্য সংখ্যা ছিল আট জন। আর এখন তাদের পরিবারে লোকসংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৫ জনে।'

হরিজন কলোনীর পরিমল হাড়ি জানান, 'ভোটাধিকার থাকলেও এদেশে তারা পূর্ণ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে হয়ত কলোনীর অনেক বাসিন্দার সামর্থ হয়েছে জমি কিনে আলাদা বাড়ি করে ভালভাবে বসবাস করার। কিন্তু তারপরও তারা তা করতে পারছেন না। হরিজন বলে কেউ তাদের কাছে জমি বিক্রি করছেন না।' তিনি ক্ষোভের সাথে জানান, 'তিনি নিজেই একসময় কলোনীর বাইরে একটি জমি কিনতে চেয়েছিলেন, দরদাম ঠিক হওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তিনি তা কিনতে পারেননি। জমি বিক্রেতা শেষ পর্যন্ত তার কাছে জমি বিক্রি করেনি। কারণ, হরিজনকে প্রতিবেশী না

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য আশেপাশের লোকজন তার ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন।' জমি কিনতে না পেরে পরিমল হাড়ি আর কলোনীর নোংরা, ঘিঞ্জি পরিবেশের বাইরে বসবাস করার সুযোগ পাননি। কলোনীতে থাকতেই বাধ্য হয়েছেন।

দেশের একজন নাগরিক হিসেবে কি কি অধিকার রয়েছে এবং কি ধরনের অধিকার তার ভোগ করার কথা পরিমল তা বোঝেন না। শুধু বলেন, 'সুইপার হলেও আমাদের ভোট রয়েছে। আর ভোট থাকলে নাকি সব অধিকার পাওয়া যায়।'

হরিজন কলোনীর অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পরিমলের মত তারা কেউই বসতবাড়ি সংক্রান্ত তাদের অধিকার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। তারা শুধু বলেন, 'কলোনীর বাইরে বাড়ি করা তাদের জন্য নিষেধ।' বিষয়টি নিয়ে কথা হয় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী আইরিন জাহানের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'সংবিধানের ৩৬ নং ধারায় দেশের যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হয়েছে। ('জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেলা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।') হরিজনদের বসবাসে বা বসতি স্থাপনে যদি কেউ বাঁধা দেয় সেটা অবশ্যই সংবিধানের ৩৬ নং ধারার লঙ্ঘন হবে। হরিজনরা এক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে।'

হরিজন কলোনীর উজ্জল রবিদাসের পরিবারে সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। সবাই মিলে ১০ বর্গফুটের একটি ঘরে থাকেন। উজ্জ্বলের সঙ্গে থাকেন তার মা, দাদা-বৌদি এবং তাদের দু'ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা। পরিবারে শিশুর সংখ্যা ৬ জন। পরিবার থেকে একজন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে চাকুরী করার সুবাদে তারা পেয়েছেন ওই ঘরটি। উজ্জ্বল জানান, 'তাদের এখন একটাই সমস্যা। সেটা হল রাতে ঘুমানোর জায়গার অভাব।'

গণকটুলী সুইপার কলোনীতেই জন্ম নিয়েছিলেন বরুণ চন্দ্র দাস। তিনি জানান, তার পরিবারে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ছয়জন। বাবা-মাসহ তারা তিন ভাইবোন এবং বরুণের স্ত্রী। মাস দুয়েক আগে বরুণ বিয়ে করেছেন। ১০ বর্গফুটের রুমটি তারা পেয়েছেন তার বাবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে

Dhaka University Institutional Repository

সুইপারের চাকুরীর সুবাদে। রুমটির মাঝামাঝি পার্টিশন দিয়ে আলাদা ঘর তৈরী করে সেখানে বৌ নিয়ে থাকছেন বরুণ। বাকি অর্ধেকে বাবা, মা এবং বাকি দুই ভাই-বোন থাকেন। মাঝে মাঝে কোন আত্মীয় এলে এরমধ্যেই গাদাগাদি করে থাকতে হয় তাদের। তিনি হতাশ হয়ে বলেন, 'পেটের চিন্তার চেয়েও বড় চিন্তা বাসস্থানের। মানুষ কত অসহায় এই সমাজের কাছে। এতগুলো মানুষের জন্য একটা মাত্র শোবারঘর। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ জীবন কোন সাধারণ মানুষের জীবন নয়। আমরা বিনা অপরাধে কয়েদীর জীবন কাটাই।'

গণকটুলী হরিজন কলোনীর ঘেরাটোপের মধ্যে কলোনী ছাড়াও অসংখ্য ঝুপড়ি ঘরের কথা আগেও বলেছি। কলোনীতে জায়গা না পাওয়ায় অনেকে নিজ ব্যবস্থাপনায় এই ঝুপড়ি ঘরগুলো তৈরী করেছেন। এগুলোর বেশিরভাগও আর ব্যবহারের উপযোগী নয়। বৃষ্টি হলে ঘরে থাকা আর বাইরে থাকা সমান। টিনের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভিজিয়ে দেয়। বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, 'হরিজন সমাজের অনেকের মাথা গোঁজার ঠাইটুকু পর্যন্ত নেই। তারা কেউ রাস্তায় ঘুমায়, কেউ সরকারী ভবনের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটায়।'

৪.৩ মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে হরিজনরা :

বেকারত্ব, হতাশা, অর্থাভাব ইত্যাদি কারণে হরিজনদের অনেকেই মাদক ব্যবসা শুরু করেছেন। কলোনীকে ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবৈধ এ ব্যবসার সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে কলোনীতে বসবাসরত মহিলা ও যুবকদের। অনেক সময় পুলিশের চোখের সামনেই চলে এই ব্যবসা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পুলিশ নিয়মিত চাঁদা নিচ্ছে এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

উল্লেখ্য, কলোনীতে মাদক ব্যবসায় অনেক মহিলা হরিজন জড়িত। অনেক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলে জানা যায়, কলোনীতে বসবাসরত মাদক ব্যবসায়ীর পেছনে থাকেন বড় বড় অ-হরিজন ব্যবসায়ী। হরিজনদের সামনে রেখে ওইসব ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছেন অবৈধ ব্যবসা।

কলোনীতে বসবাসরত রাজিব রবিদাস বলেন, 'অনেকক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-কিশোরদের দিয়ে মদ, গাঁজা, কেনসিডিল আনা-নেওয়ার কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অনেক জায়গায় হরিজনদের নামে

Dhaka University Institutional Repository

মাদক ব্যবসার লাইসেন্স করিয়ে নিয়ে অন্যান্যরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে হরিজন সম্প্রদায় অনেকটাই পরিস্থিতির শিকার। হরিজনরা অশিক্ষিত ও দরিদ্র। আর সে সুযোগটাই নিচ্ছেন কলোনীর বাইরের মাদক ব্যবসায়ীরা। তিনি আরও বলেন, হরিজনদের অভাব দূর করা গেলে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌছানো গেলে মাদকের ছোবল থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। যেসব শিশু পেটের ক্ষুধায় ফেনসিডিল বহন করছে, তাদের খাবার দিলে তারা আর ওই কাজ করবে না।'

কলোনীর বাসিন্দা চন্দ্রিমা বলেন, 'মাদক ব্যবসার কারণে কলোনীতে সারাদিন হট্টগোল লেগে থাকে। হরিজনদের মাঝে অনেকেই মদ্যপ। সন্ধ্যায় কাজ শেষে ফিরে তারা স্বল্পদামের মদ পান করে এবং মন্দিরে গিয়ে মাথা কুটে। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও অপবিত্রতার সঙ্গে ধর্মীয় পবিত্রতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।'

গবেষণায় দেখা গেছে, মন্দিরে মা কালীর কাছে হরিজনদের প্রার্থনাগুলোও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রমাণ। ছেলেদের বেশিরভাগ প্রার্থনার কথাই হচ্ছে,

'মা আমার বউয়ের যেন ইনকাম বাড়ে।'

'আমার বউ যেন আরেকজনের খপ্পড়ে না পড়ে।'

'বড় বাবু যেন আমাকে নেক-নজরে রাখেন।' ইত্যাদি।

মেয়েদের চাহিদার বেশিরভাগই কথাই হচ্ছে,

'হে মা কালী, তুমি আমার মরদকে বুদ্ধি দাও, সে যেন মদ ছেড়ে দেয়। নিজের টাকা, আমার টাকা, ছেলে মেয়েদের অন্নের টাকা সে যেন মদের পেছনে না উড়ায়।'

'আমাকে যেন প্রতিদিন না পেটায়।' ইত্যাদি।

মূলত, হরিজনদের আনন্দ-বেদনার জায়গা মদের আসর। অনেক ঝাড়ুদারেরই ভাত না খেলে চলে, কিন্তু মদ তাদের খেতেই হয়। তাই মদের আসর হরিজনদের দৈনন্দিনতার সঙ্গেই মিশে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

হরিজনদের জীবন ও জীবিকা

৫.১ পৈত্রিক পেশা :

গণকটুলী সুইপার কলোনীর অনেক হরিজনই পৈত্রিক পেশা থেকে ছিটকে পড়ছেন। চৌদ্দ পুরুষের পেশা আকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে তাই তারা মরিয়া। পাশাপাশি তারা শঙ্কিত তাদের আদি পেশা নিয়ে। গণকটুলীর হরিজনদের অধিকাংশই সুইপার বা ঝাড়ুদারের পেশায় নিয়োজিত। এই পেশাতে তারা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। কিন্তু তাদের কাছে পৈত্রিক পেশা বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। এ পেশা থেকে জোর করে তাদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাত্র ২০ বছর আগে এদেশের হরিজনরা যে চিন্তা করেননি এখন তাদের সেই চিন্তা করতে হচ্ছে। তাই তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের দাবীর পাশাপাশি আদি পেশা টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

গণকটুলীর হরিজনরা মনে করেন তাদের পেশা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আর এজন্য সরকারই দায়ী। কেননা, দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সুইপার পদে কারা চাকুরী পাবেন এবং তারা কত বেতন পাবেন এসব বিষয়ে স্পষ্ট কোন নীতিমালা না থাকার কারণেই হরিজনদের এই অবস্থা।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের উদাহরণ দিয়ে গণকটুলীর বাসিন্দা বরুণ চন্দ্র দাস বলেন, 'ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর কিছু চাকুরী রয়েছে যেগুলো শুধু দলিত বা হরিজনদের জন্যই সংরক্ষিত। ভারতে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার মত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুইপার পদে হরিজন ছাড়া কোন সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিয়োগ দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে সেখানে স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৪১ বছর পরও সে ধরনের কোন নীতিমালা তৈরী হয়নি।' বরুণ আরও বলেন, 'নীতিমালা না থাকার কারণেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হরিজনদের বাদ দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সুইপার পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে হরিজনরা যে বঞ্চিত হচ্ছেন সেদিকে কারও খেয়াল নেই।'

Dhaka University Institutional Repository

গণকটুলী সুইপার কলোনীর বাসিন্দা রাজিব রবিদাস বলেন, 'তাদের জীবন জীবিকার একটাই পথ–আর তা হল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুইপারের কাজ করা। এক্ষেত্রে বড় কর্মক্ষেত্র হল দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো। যেহেতু নগর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোই পালন করে। তাই সেখানে স্থায়ীভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক সুইপার কাজ করে। একসময় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ঝাড়ুদার বলতে শুধু হিন্দু হরিজনদেরই বোঝানো হত। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন মুসলমান অনেকেই সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে ঝাড়ুদারের কাজ করছে। ফলে সংকুচিত হয়ে এসেছে হিন্দু হরিজনদের কর্মক্ষেত্র।' এক্ষেত্রে রাজিব অভিযোগের সুরে বলেন, 'মুসলমানদের ঝাড়ুদারের কাজে নিয়োগ দিয়ে বংশ পরম্পরায় নিয়োজিত হিন্দু হরিজনদের তাদের পৈত্রিক পেশা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

গণকটুলী সুইপার কলোনীতে তিন পুরুষ ধরে বসবাসরত ঝাড়ুদার শিবু মন্ডলের মতে, 'বছর বিশেক আগেও দেশের সব সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও সরকারী অফিসে সুইপার পদে হরিজন ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের কেউ ছিল না। অন্য সম্প্রদায়ের কাউকে নিয়োগই দেওয়া হত না। আর বর্তমানে পরিস্থিতি তার একেবারে উল্টো। এখন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোয় হরিজন সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। সরকারী-বেসরকারী অফিস, কোর্ট-কাছারি, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা–সব জায়গা অ-হরিজন সুইপারে ভরে গেছে। এর ফলে হরিজনরা তাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া আদি পেশা হারাচ্ছে। জীবন বাঁচাতে অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'সুইপার বলে যারা আমাদের ঘৃণা করে; তারাই এখন প্রকাশ্যে সুইপারের কাজ করে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে, ব্রিটিশ আমলে আমাদের চাকুরীর অনেকটা নিশ্চয়তা ছিল, পারিশ্রমিক ছিল জীবন রক্ষার উপযোগী। পাকিস্তান আমলে আমাদের স্বস্তির জায়গায় ভাঙন শুরু হয়। স্বাধীনতার পর আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভাঙন প্রায় সম্পূর্ণ হয়।'

হরিজনদের এই অভিযোগের সত্যতা মিলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনেই। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, সেখানে স্থায়ীভাবে কর্মরত সুইপারদের বেশিরভাগই অ-হরিজন ও মুসলমান। হরিজন পরিমল দাসের মতে, 'অ-হরিজন মুসলমানরা এই পেশায় না এলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা তাদের পৈত্রিক পেশা থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। কিন্তু সেই পথ এখন রুদ্ধ।' বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, 'আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যত অন্ধকার। আমরা অবহেলিত বলেই আমাদের চাকুরী, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার কোন নিশ্চয়তা নেই।' ঠিক একই ধরনের ক্ষোভ প্রকাশ করে গণকটুলী সুইপার কলোনীর কার্তিক চন্দ্র দাস বলেন, 'যুগ যুগ ধরে আমরা সুইপারের কাজ করছি। মল-মূত্র-আবর্জনা পরিষ্কার করি। এসব কাজ করি বলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কোথাও যেতে পারে না, বাসা-বাড়ীতেও কেউ আমাদের কাজে নেয় না। সবাই ঘৃণা করে। তাই আমাদের জীবিকার পথ বলতে ওই একটাই; ঝাড়ুদারের কাজ। সেটাও যদি আমরা না পাই তবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার আর কোন উপায় থাকবে না।'

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সুইপার সুলেখা হাড়ি বলেন, 'সরকার আমাদের পেটে লাথি মারছে। আমাদের আদি পেশা কেড়ে নিচ্ছে।' হরিজনদের প্রতি এ ধরনের অন্যায়, অবিচারের কারণ তিনি জানেন না। শুধু প্রশ্ন রাখেন, 'কাজ না পেলে, আমরা যাব কোথায়? আমরা কি না খেয়ে মারা যাবো?' গণকটুলী সুইপার কলোনীর রাজিব রবিদাস বলেন, 'ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র সাদেক হোসেন খোকার সাথে সুইপার নিয়োগ প্রসঙ্গে কথা হয়। এক্ষেত্রে হরিজন নিয়োগ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মেয়র তাঁর মতামত তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সিটি কর্পোরেশনে সুইপারসহ সব পদে নিয়োগ দেয়া হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে। যোগ্যতাই এখন চাকুরীর মাপকাঠি। অ-হরিজন মুসলমানরা এখন সিটি কর্পোরেশনে সুইপারের কাজ করতে আসছেন। যারা চাকুরী পাচ্ছেন তারা যোগ্যতার মাপকাঠিতেই পাচ্ছেন। কর্মসংস্থানের সংকট ও অভাব অনটনের কারণে অ-হরিজন মুসলমানরা এ পেশায় আসছেন। তাছাড়া সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যে কেউ সুইপারের পেশা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ নেই। শুধু হরিজন সম্প্রদায়ের লোকেরাই সুইপারের চাকুরী পাবেন এমন কোন আইন দেশে নেই।' রাজিব রবিদাস আরও বলেন,'তবে সুইপারের কাজটি যেন হরিজনরাই পান সেদিকে সকলের খেয়াল রাখা দরকার বলে মতামত প্রকাশ করেছিলেন মেয়র সাদেক হোসেন খোকা। কারণ, এটাই তাদের জীবিকার একমাত্র পথ।'

সুইপার হরিলাল দাস বলেন, 'ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত কোন অফিস আদালতে হরিজন সম্প্রদায়ের বাইরে একজন ঝাড়ুদারও ছিল না। আর এখন হরিজন সুইপারের চেয়ে অ-হরিজন সুইপারই বেশি।'

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী মাহবুবুর রহমান মনে করেন, 'হরিজনরা যেহেতু তাদের আদি পেশা থেকে ছিটকে পড়ছে তাই তাদের বিকল্প পেশার ব্যবস্থা সরকারকেই করে দিতে হবে। তাদের ব্যাপারে আলাদা কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। হরিজনরা যেহেতু এদেশের নাগরিক তাই দেশের কাছ থেকে তাদের অনেক কিছু পাবার রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে বেসরকারী সংস্থাগুলোকে।'

সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী মাহমুদা চৌধুরী বলেন, 'এদেশে হরিজনদের প্রতি সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে ঝাড়ুদারি পেশা ছাড়া অন্য কিছু করে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের জন্যে সত্যিই কঠিন। হিন্দু বা মুসলিম কেউই তাদেরকে সম-অধিকার সম্পন্ন মানুষ বলে ভাবতে পারে না। সবাই অস্পৃশ্য বলে প্রচন্ড ঘৃণা করে। এজন্য হরিজনদের মুদি দোকান হোক আর চায়ের দোকান হোক কোনটাই চলে না। এটি এক ধরনের সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তিনি আরও বলেন, 'হরিজনরা যেহেতু এ সমাজেরই মানুষ এবং তাদের খেয়ে-পড়ে বাঁচতে হবে, তাই ঝাড়ুদারের কাজ দেয়া না গেলে তাদেরকে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সুইপারের চাকুরী থেকে যদি হরিজনদের বঞ্চিত করা হয় এবং বিকল্প কাজের ব্যবস্থাও করে দেয়া না হয়, তবে তাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা হয়তো বাধ্য হবে বিপথগামী হতে।'

৫.৩ আয় রোজগার ও ব্যয় :

গণকটুলী সুইপার কলোনীতে গিয়ে পেশার বিভিন্ন প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। গড়ে প্রত্যেক পরিবারের মাথা পিছু আয় প্রতি মাসে ২৫০০-৩০০০ টাকা। যে সমস্ত পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পেশাগত কাজে নিয়োজিত তাদের মাসিক আয় কিছুটা বেশি। পরিবারের সদস্যরা চেষ্টা করে মাসিক মাথাপিছু আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে। অনেক ক্ষেত্রেই তা অবশ্য রাখা যায় না। আয়ের থেকে ব্যয় মাঝে মাঝে বেশি হয়। তখন পরিবারের সদস্যরা অন্যের কাছে ধার করেন। বড় ধরনের খরচ হয় মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে। কেননা বিয়ের সময় গহনা, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অনেক উপহার সামগ্রী প্রদান করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ ভাগ্যহীন এক ভাগ্যলক্ষ্মী রাণী :

গণকটুলী সুইপার কলোনীতে জন্ম নেওয়া এক নারী ভাগ্যলক্ষ্মী রাণী। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ঝাড়ুদার পদে কর্মরত। ভাগ্যলক্ষ্মী রাণীর ঘরে লক্ষ্মী দেবী নেই। আছে দুর্ভোগ, দারিদ্র, হতাশা আর যন্ত্রনা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ভাগ্যলক্ষ্মীর বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই সন্তান নেওয়া শুরু। একে একে ঘরে আসে সাত ছেলে-মেয়ে। বছর দুয়েক আগে তিনি তার বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই মেয়ে সংসারই শুরু করতে পারেনি। ১৬ বছরের সেই মেয়ে এখন বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন। কারণ অন্য কিছু নয়। বিয়ের সময় যে যৌতুকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা আজও দেওয়া হয়নি বলে স্বামী তাকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখেছেন।

ভাগ্যলক্ষ্মীর স্বামী দিলীপ বাঁশফোর বেকার। অনেক চেষ্টা করেও একটি চাকুরী যোগাড় করতে পারেনি। হাতে স্থায়ী কোন কাজও নেই। যা আয় করেন তাতে সংসার চলে না। দিলীপের বাবা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সুইপার ছিলেন। সেই সুবাদে গণকটুলী সুইপার কলোনীতে তারা একটি থাকার জায়গা পেয়েছেন। জায়গা বলতে ১০ বর্গফুটের একটি ঘর। ওই ঘরেই ভাগ্যলক্ষ্মী ও দিলীপ তাদের সাত সন্তান নিয়ে রাত কাটান।

ভাগ্যলক্ষ্মী রাণীর প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রাম শুরু হয় সেই ভোরবেলা। সূর্য ওঠার আগেই সাত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তিনি ছোটেন কাজের সন্ধানে। সবাই মিলে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। ভাগ্যলক্ষ্মী বলেন, 'কাজ করি ঠিকই, কিন্তু মাস শেষে যে টাকা মাইনে পাই তা ভিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক'টাকা দু'টাকা আমাদের পরিশ্রমের দাম। তাও কেউ দেয়, কেউ দেয় না।' তারপরও তিনি ছেলে-মেয়ে বিয়ে এ কাজ করে চলেছেন বছরের পর বছর ধরে। এছাড়া তো আর বাঁচবার উপায় নেই।

কিন্তু অভাবের সংসারে এত সন্তান কেন? প্রশ্ন করলে, ভাগ্যলক্ষ্মী বলেন, 'আমার কিছু করবার ছিল না ভাই। একটার পর একটা বাচ্চা পেটে আইছে। কোনভাবেই সন্তান আসা বন্ধ করতে পারি নাই।' তবে সন্তান না নেয়ার জন্য ভাগ্যলক্ষ্মী কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। এখনও তেমন কোন ধারণা নেই। ঘনঘন সন্তান জন্ম দিয়ে তার শরীর ভেঙে গেছে। এখন কাজ করেন খুব কষ্ট করে। ঝাড়ু দেয়ার সময় একটু পরপর হাঁপিয়ে ওঠেন। ভাগ্যলক্ষ্মী

Dhaka University Institutional Repository

জানালেন, শেষ সন্তানটি জন্ম দেয়ার সময় তিনি প্রায় মরেই যাচ্ছিলেন। সন্তান প্রসবের সময় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; কিন্তু সুইপার বলে সেখানে তার চিকিৎসা করা হয়নি। অবশেষে গণকটুলী সুইপার কলোনীর ১০ বর্গফুটের ঘরেই তার সন্তান জন্ম নেয়। তিনি বলেন, 'ওইবার একেবারে ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। মরে গেলে অন্য সন্তানগুলোর যে কি অবস্থা হতো সেটাই এখন ভাবি।' আর যেন সন্তান না হয় সেজন্য ভাগ্যলক্ষ্মী গণকটুলী সুইপার কলোনীর ভেতরে অবস্থিত মন্দিরে গিয়ে মানত করেছিলেন। কিন্তু তাতে তেমন কোন কাজ হয়নি। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কথা বলতেই ভাগ্যলক্ষ্মীর তরিৎ জবাব, 'ওষুধ কেনার টাকা পাব কোথায়? অভাবের কারণে পেটের ভাত যোগাড় করতে পারি না আর টাকা খরচ করে বাচ্চা বন্ধের ওষুধ কিনতে পারি?' তিনি আরও বলেন, 'অভাবের কারণে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারিনি। কিছু বুঝতে না বুঝতেই সবাইকে দু'পয়সা রোজগারে নামিয়ে দিয়েছি। নাম আমার ভাগ্যলক্ষ্মী হলেও আমার ঘরে লক্ষ্মীদেবী নেই।' বাচ্চাদের নিয়ে স্বামীর কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বাচ্চাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুব কষ্ট পান। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'মানুষ হিসেবেই আমাদের জন্ম, কিন্তু সমাজে মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ সুবিধা আমরা পাইনি। আমরা হরিজন, আমরা অস্পৃশ্য।'

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

হরিজন নারী

হরিজন সমাজ পুরুষ শাসিত। নারীরা এই সমাজে সত্যিই অবলা। নারীদের বাসনার তেমন বাস্তবায়ন হয় না এই সমাজে। প্রয়োজনবোধ করলে পুরুষরা নারীদের পরামর্শ নেন, তবে সেই পরামর্শের বাস্তবায়ন পুরুষদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বহুকাল আগে থেকেই হরিজন নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল নয়। উপার্জন করেন তারা, তবে উপার্জনে হাত বাড়ায় পুরুষরা। পুরুষরা মানে স্বামীরা। হরিজন সমাজে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক সংসারমুখী। সন্তানদের আনন্দ-বেদনা আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তারা অনেকটাই চিন্তিত থাকেন। তারপরেও অনেকক্ষেত্রে বিবাহিত নারীরা নির্যাতনের শিকার হন।

৬.১ মজুরিগত বৈষম্য :

গণকটুলী সুইপার কলোনীতে বসবাসরাত নারীদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। দিনভর তারা ঝাড়ু হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু শ্রমক্ষেত্রে হরিজন নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার। সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীরা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় মজুরি কম পান। পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে তারা সমান তালে কাজ করেন। কাজে কোন ধরনের ফাঁকি তারা দেন না। অথচ তারপরেও হরিজন নারীকে বেতন দেওয়া হয় পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেক।

ঢাকার একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুইপারের কাজ করেন বিমলা হাড়ি। পাঁচ বছর ধরে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিনই কাজে যেতে হয় তাকে। সকাল আটটায় অফিসে পৌঁছে বাসায় ফেরেন বিকেল পাঁচটায়। সারাদিনই তাকে সেখানে ধোয়া-মোছার কাজ করতে হয়। অসুস্থ না হলে বিমলার অফিসে যাওয়া বাদ নেই। কিন্তু তারপরও তিনি মজুরি বৈষম্যের শিকার। বিমলা জানান, 'তার দেবর অন্য অফিসে একই ধরনের কাজ করে মাসে পান দেড় থেকে দুই হাজার টাকা। আর তাকে দেয়া হয় এক হাজার টাকা। এই মজুরি বৈষম্যের কারণ তিনি জানেন না। একে ওকে জিগ্যেস করেও কোন উত্তর পাননি।' কেউ কেউ তাকে বুঝিয়েছেন, 'পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরি কম এবং এটাই নিয়ম।' বিমলা একবার বেতন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তার প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা তাকে সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন, 'এর বেশি বেতন তাকে দেওয়া সম্ভব নয়। বেশি বেতন চাইলে তাকে কাজ থেকে বাদ দেয়া হবে।' চাকুরি হারানোর ভয়ে তিনি এ বিষয়ে আর একটি কথাও বলেননি। বিমলা বলেন, 'আমার ঘরে ছয়জন খানেওয়ালা। কামাই করি দু'জন; স্বামী-স্ত্রী। স্বামী সুনীল হাড়ি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুইপার। তাছাড়া বাড়তি আয়ের জন্যে ছুটির দিনে বাসায়-বাসায় ঘুরে ল্যাট্রিন পরিষ্কার করে সুনীল। দিন শেষে কোনদিন দেড়শ' দু'শ টাকা আয় হয়, কোনদিন কিছুই হয় না। তাই সংসারের অভাবের কারণে বেতন কম হলেও আমাকে চাকুরীটা করতেই হচ্ছে। চাকুরী না করলে ছেলে-মেয়েদের মুখে খাবার দেয়া যাবে না।'

বিমলার মত মজুরি বৈষম্যের শিকার হরিজন সম্প্রদায়ের বহু নারী। কোন কারণ ছাড়া তারা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় বেতন পাচ্ছেন কম। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পাবার কথা। নারী-পুরুষ মজুরি বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চিত করেই বলা যায়, বাংলাদেশে এই সনদ খুব সামান্যই মানা হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধে আরও কার্যকর আইন প্রণয়নের কথা জানান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, '১৯৬৫ সালের কারখানা আইন ও ১৯৬৯ সালের শ্রম আইনে নারী শ্রমিকদের অধিকারের কথা উল্লেখ নেই। যদিও এ দুটি আইন এখনও প্রচলিত। এ কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশের নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। হরিজনদের অধিকার নিয়ে যেহেতু বলার কেউ নেই; তাই তাদের প্রতি বৈষম্য আরও বেশি।'

বেসরকারী সংস্থা 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'র রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে শ্রমক্ষেত্রে নিয়োজিত মহিলার সংস্থা শতকরা ৪৩ জন। এই সংখ্যা শহরের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেশি। তবে শহর ও গ্রাম উভয়ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যের শিকার। একই ধরনের কাজের জন্য একজন নারী শ্রমিক যা পান একজন পুরুষ শ্রমিক পান তার প্রায় দ্বিগুণ। অন্যদিকে 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ' এর গবেষণায় জানা যায়, ১৯৮০ এর দশকের প্রথমার্ধের তুলনায় ১৯৯৬ সালে দেশে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার আট শতাংশ বেড়েছে। ১৯৮০ এর দশকে ওই হার ছিল ২.৭ শতাংশ। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা বা শ্রমশক্তি যেভাবে বেড়েছে শ্রমক্ষেত্র ঠিক সেভাবে বাড়েনি। এ কারণেই শ্রমের সহজলভ্যতা তৈরি হয়েছে।

সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী মাহমুদা চৌধুরী নারীর শ্রম শোষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'দেশের নারী শ্রমিকরা শোষণের শিকার। আইএলও ঘোষণার ৮৭ ও ৯৮ ধারা অনুযায়ী নারী শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে সংগঠিত হতে পারে।' হরিজন নারীদেরও একই অধিকার রয়েছে বলে তিনি জানান।

গ্রামে কাজের সুযোগ সুবিধা বাড়লেও বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মহিলা কাজের সন্ধানে শহরে আসছে। এদের মধ্যে অনেক হরিজন নারীও আছে। তাদের অনেকেই হয় বিধবা নয়তো সন্তানসহ স্বামী পরিত্যক্তা। তাদের পরিবার এতই গরীব যে খেতে পর্যন্ত পায় না। শহরে বসবাস করে তাদের একটাই ভাবনা–কোথায় বাড়তি একটু কাজ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে যখন কেউ গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক হিসেবে অথবা বাসা-বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে কাজ পায় না তখন তাদের যে কাজের প্রস্তাব দেয়া হয় অনেকক্ষেত্রে পেটের তাগিদে তারা সেটাই করে। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে নির্মাণ-শ্রমিকের কাজ পাওয়া অনেকটা সহজ। আর ওইসব অসহায় মহিলা খুব কম মজুরিতে কাজ করতে রাজী হন। এক্ষেত্রে হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাসের মতে, 'শ্রমের সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে অন্য নারী শ্রমিকদের যেভাবে ঠকানো হয় একইভাবে হরিজন নারী শ্রমিকদেরও ঠকানো হয়।' তিনি আরও বলেন, 'সারা দেশেই হরিজন নারীরা একইরকম মজুরি বৈষম্যের শিকার। তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। কোথাও পুরুষ শ্রমিকদের দু'হাজার টাকা দেয়া হলে নারী শ্রমিকদের দেয়া হয় এক থেকে দেড় হাজার টাকা।'

একথা চরম সত্য যে, বাংলাদেশে নিয়োগকর্তারা মনে করেন, নারী শ্রমিকরা শারীরিকভাবে দুর্বল এবং পুরুষের তুলনায় তারা কাজ করেন কম। সে কারণে শুধু হরিজন নারী নয়, বাংলাদেশে সব সম্প্রদায়ের নারীরাই শ্রমক্ষেত্রে কমবেশি মজুরি বৈষম্যের শিকার।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ মাতৃকালীন ছুটির অস্বীকৃতি :

দেশে সরকারী চাকুরীর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী একজন কর্মজীবী নারী মাতৃত্বকালে সর্বোচ্চ চার মাসের ছুটি ভোগ করতে পারেন। কিন্তু হরিজন সম্প্রদায়ের নারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত এই বিধান উপেক্ষিত। সরকারী, আধা-সরকারী অথবা বেসরকারী যে প্রতিষ্ঠানেই তারা কাজ করুক না কেন, কোন জায়গা থেকেই মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না। গণকটুলী সুইপার কলোনীর বাসিন্দা তাপসী রাণী দাস বলেন, 'হরিজন সম্প্রদায়ের যেসব নারী বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুইপারের কাজ করেন মাতৃত্বকালে তাদের ভাগ্যে কোন ছুটি জোটে না। অনেকে সন্তান জন্মের কয়েকদিন আগ পর্যন্ত কাজ করেন। আবার সন্তান প্রসবের সাতদিন যেতে না যেতেই তাদেরকে কাজে যোগ দিতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে মায়েরা তাদের শিশুসন্তানকে কোলে নিয়েই অফিসে গিয়ে হাজির হন। অফিসের বারান্দায় সন্তানকে শুইয়ে রেখে ঝাড়ুদারির কাজ করেন। চাকুরী টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তাদের এটা করতে হয়।' তার বোন সুতপা রাণী দাস বলেন, 'চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি বিষয়টি অনেক হরিজন নারীর কাছেই অজানা।'

৬.৩ অবহেলিত প্রজননস্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব :

গণকটুলী সুইপার কলোনীগুলোতে গিয়ে দেখা গেছে, হরিজন সমাজে নারীর প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতাও খুব কম। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বিগত দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও হরিজন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নারী এখনও সেই ফোকাসের বাইরে। তারা স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। তাই একেক দম্পতির পাঁচটি-সাতটি করে সন্তান। অনেকের সন্তানসংখ্যা এরচেয়েও বেশি। কলোনীগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগ নারীরই এ বিষয়ে কোন ধারণা নেই। প্রজনন স্বাস্থ্য কি সেটা তারা বোঝেন না।

কথা হল হরিজন কলোনীর গীতা রাণীর সঙ্গে। শীর্ণ চেহারা, কোলে এক বছরের একটি ছেলে। তিনি জানান, তার আরও চারটি সন্তান আছে। গীতার বয়স ২৫। মাথার চুল প্রায় অর্ধেক পড়ে গেছে। হাত-পায়ে পানি জমে টস টস করছে। পুষ্টিহীনতা যেন তার ওপর জেকে বসেছে। তার কোলের সন্তানটির অবস্থাও একই রকম। চিকন হাত-পা কিন্তু পেট ফুলে আছে ফুটবলের মত। গীতার সব সময়ই মাথা ঘোরে। খাওয়ায় একদম রুচি নেই। হাত-পা ঝিম ঝিম করে ২৪ ঘণ্টা। ক'দিন আগে

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। ডাক্তার দেখে বলেছেন, অল্প বয়সে অনেক সন্তান নেওয়ার কারণেই তার এই অবস্থা হয়েছে। গীতার যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। পরবর্তীতে তিনি আরও চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কথা বলতেই গীতার চটপট উত্তর, 'আমরা ওসব করি না। পেটের সন্তান মারা পাপ।' জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ্ধতি সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। গীতা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু কনডম ব্যবহারের কথা শুনেছেন। তবে সেটি ব্যবহার করা না করা একান্তই তার স্বামীর ব্যাপার বলে তিনি জানান।

দেশে জাতীয় প্রজনন স্বাস্থ্যনীতি প্রথমবারের মতো গ্রহণ করা হয় ১৯৯৭ সালে। নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের যে চারটি বিষয় এতে প্রাধান্য পায় তা হল–নিরাপদ মাতৃত্ব; পরিবার পরিকল্পনা; মাসিক নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভপাত পরবর্তী জটিলতার যত্ন; যৌন সংক্রমণ রোগ/প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা। হরিজন কলোনীগুলোতে এই নীতির কোন কার্যকারিতা নেই। এছাড়া কলোনীগুলোতে মেয়েদের বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি। মেয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় এবং অল্প বয়সেই তারা মা হয়ে যান। হরিজন লোকজন অবশ্য বলেন, এই বাল্য বিয়ের প্রবণতা দিন-দিন বেড়েই চলেছে এবং এর কারণ হল, কিশোরী মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।

গণকটুলী হরিজন কলোনীর নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে কথা বলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক সায়রা মনির। তিনি বলেন, 'হরিজন মেয়েরা সহজ সরল। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বেশিরভাগ মেয়েই শুনতে চাননা। তবে যারা একটু লেখাপড়া জানেন কেবল তারাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এই হার শতকরা পাঁচ/ছয় এর বেশি নয়। কিশোরীদের মধ্যে প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।' তিনি আরও বলেন, 'বয়ঃসন্ধিকালে প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার কথা বাবা-মায়ের কাছ থেকে; কিন্তু হরিজন সমাজে যেহেতু বাবা-মায়েরাই কিছু জানেন না, তাই তাদের সন্তানদের এ বিষয়ে কোন ধারণা দিতে পারেন না।' বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক সম্যক ধারণা দিতে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বইয়ে মেয়েদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়; হরিজন কিশোরীদের অনেকে স্কুলে না যাওয়ার কারণে এই পদ্ধতিও কাজে আসছে না। তাছাড়া, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে দেশের বৃহত্তর জেলাসমূহের তিনটি করে ইউনিয়নে যুব প্রকল্প নামে একটি

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম শুরু করেছে। ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া ওই প্রকল্পের অধীনে ১০ বছর থেকে ২৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রকল্পের অধীনস্ত এলাকার অভিভাবকদের কাছেও যৌন ও প্রজনন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এফপিএবির হিসাব অনুযায়ী, সমিতির ২০টি শাখার মাধ্যমে ৭০টি ইউনিয়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, হরিজন কলোনীগুলোতে এই কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি।

গর্ভজনিত মৃত্যু হরিজন নারীদের জন্য একটি মারাত্মক ঝুঁকির কারণ। হরিজন মেয়েরা বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ায় অল্প বয়সেই গর্ভধারণ করে। আর সে কারণে তাদের মধ্যে মাতৃত্ব ঝুঁকি থেকেই যায়। গর্ভাবস্থায় প্রায় প্রত্যেকেই নানারকম সমস্যায় ভোগেন। যারা বাল্যবিবাহের শিকার তাদের সমস্যা অনেক বেশি। তাদের সন্তান প্রসবকালেও নানা জটিলতা দেখা দেয়। প্রসবকালে অনেকের মৃত্যুও হয়। কিন্তু হরিজনরা এ ব্যাপারে তেমন ভাবেন না। তারা গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সমস্যাগুলোকে বিবেচনা করেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, প্রসবকালে কোন মায়ের জটিলতা দেখা দিলে তারা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে, মন্দিরে গিয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন তাদের সমস্যা দূর করার জন্যে। এছাড়া, প্রসবকালে সাধারণত তারা প্রশিক্ষিত কোন দাই বা নার্সকে ডাকেন না। কলোনীর মেয়েরাই তাদের দাইয়ের কাজ করেন। নার্স ডাকার রীতি হরিজন সমাজে নেই। হাতুরে দাইদের ভুলে অনেক হরিজন মায়ের সন্তান প্রসবকালেই মারা যায়।

৬.৪ নিরাপত্তাহীনতা :

তিন বছর আগে বিউটি রাণীর যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল ১৩ বছর। বিউটির কোলে এখন দু'টি সন্তান। ছোট সন্তানের বয়স দু'মাস। গণকটুলী সুইপার কলোনীর ছোট্ট একটি ঘরে বিউটি থাকেন সন্তান, স্বামী আর শাশুড়িকে নিয়ে। স্বামী রবিলাল দাস চাকুরী করেন ঢাকার একটি সরকারী হাসপাতালে। বেতন পান চার হাজার টাকা। বিউটি রাণীর শীর্ণ চেহারা। কোলের সন্তানটি বুকের দুধ পায় না। জ্বর, মাথা-ব্যথা, হাত-পা ঝিম-ঝিমসহ নানা অসুখ বিউটির লেগেই আছে। রবিলাল দাস হাসপাতালে চাকুরী করলেও অসুখ-বিসুখে স্ত্রীকে হাসপাতালে নেন খুব কমই। দ্বিতীয় বাচ্চা যখন পেটে তখন হঠাৎ করে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন বিউটি। সেদিন ক্লিনিকে নিলে ডাক্তার বলেছিলেন, দ্বিতীয় সন্তানটি নেয়া তাদের ঠিক হয়নি। এমনিতেই অল্প বয়সে বিয়ে, তারপর তিন বছর যেতে না যেতেই দু'টি বাচ্চার মা। স্বামী-স্ত্রী দুজনের ওপরই সেদিন রেগে গিয়েছিলেন ডাক্তার।

Dhaka University Institutional Repository

বিউটিকে বকাবকি করেছেন কিশোরী অবস্থায় বিয়ে করার জন্য। বিউটিকে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার বলেছেন, ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হওয়ায় বিউটির যে ক্ষতি হয়েছে, তা কোনদিন পূরণ হবার নয়। বিউটিকে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ্য করে তোলা কঠিন।

বিউটির এ অবস্থার জন্য সে নিজে দায়ী নয়–একথা ঠিক। কিন্তু কি কারণে বিউটির বাবা-মা এতো অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিলেন সেটি জানা গুরুত্বপূর্ণ। বিউটি নিজে বিয়ের সময় ওই কারণ বুঝতে না পারলেও এখন বুঝতে পারছেন। পাড়ার বখাটে ছেলেরা একদিন মাতাল হয়ে তাদের কলোনীর সামনে এসে বিউটি-বিউটি বলে চিৎকার করছিল। লুকিয়ে রেখে সেদিন মাতাল-লম্পটদের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করেছিলেন বিউটির বাবা-মা। এর পরদিন থেকেই শুরু হয় বিউটির জন্য পাত্র খোঁজা। একমাসের মধ্যে তার বিয়ে হয়ে যায়। বিউটি বলেন, 'বড় হওয়ার সাথে-সাথে আমাকে নিয়ে বাবা-মায়ের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার বিষয়টি আমি বুঝতে পারছিলাম। একসময় তারা কোথাও যেতে দিতেন না। সবসময় চোখে-চোখে রাখতেন। মা বলতেন, পাড়ায় কিছু খারাপ ছেলে আছে। ওদের সামনে যাবি না।' মূলত এই আশঙ্কা ও চিন্তা থেকেই তাকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিউটি। তিনি আরও বলেন, 'আমাকে যখন বাবা-মা বিয়ের কথা বলেছেন, তখন আমার করার কিছুই ছিল না। মন চাচ্ছিল না বিয়ে করি, কিন্তু বাবা-মার দুশ্চিন্তার কথা ভেবে বিয়েতে মত দিয়ে দেই।'

বিউটির মত এরকম বাল্যবিবাহের শিকার হরিজন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মেয়ে। ইদানিং এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য হরিজন কলোনীগুলোর মত গণকটুলীতেও উঠতি বয়সী মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা যায়। কলোনীগুলোতে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পাওয়ার এটিই মূল কারণ। সারাদেশেই এই সম্প্রদায়ের বাবা-মায়েরা বিয়ের বয়স হওয়ার আগে মেয়েকে বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। হরিজন কলোনীর বাসিন্দা রতন লাল বলেন, 'কলোনীতে কোন মেয়ে বড় হলে তার উপর বাইরের মাস্তানদের দৃষ্টি পড়ে। রাস্তা-ঘাটে তাকে উৎপাত করতে শুরু করে। কুপ্রস্তাব দেয়। তাই মেয়ে বড় হলে সব বাবা-মায়েরা চিন্তায় পড়েন।' তিনি আরও বলেন, 'কিশোরী মেয়েদের কাজে পাঠানোও ঝুঁকিপূর্ণ। কলোনীর বাইরে কোথাও তারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে না। মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে তাই দুশ্চিন্তায় থাকেন হরিজন কলোনীর প্রত্যেক বাবা-মা। সে কারণেই তারা অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন।'

Dhaka University Institutional Repository

গণকটুলী হরিজন কলোনীর বাসিন্দা বরুণ বলেন, 'হরিজন সমাজে অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন বহু পুরনো। মেয়ের বয়স ১৩/১৪ হলেই বাবা-মায়েরা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তবে একথাও ঠিক যে, মেয়ের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে বাবা-মায়েদের দুশ্চিন্তাই হরিজন সমাজে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। তাছাড়া অন্যান্য কারণও বিদ্যমান। যেমন : বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে হরিজনদের মধ্যে কোন ধারণাই নেই। এ ব্যাপারে তারা মোটেও সচেতন না। হরিজন সমাজে শিক্ষার আলো না পৌঁছার কারণে তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে কোন সচেতনতা আসছে না। তাছাড়া হরিজন সমাজে যোগ্য পাত্র পাওয়া বেশ কঠিন। তাই যখন কোন বাবা তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পান সাথে সাথেই তিনি তাতে রাজী হয়ে যান। মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে তখন আর কিছু ভাবনা-চিন্তা করেন না।'

গণকটুলী হরিজন কলোনীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উপমা দাস। বর্তমানে ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইতিহাসে অনার্স পড়ছেন তিনি। বাল্যবিবাহের মূল কারণ হিসেবে অশিক্ষাকেই দায়ী করেছেন তিনি। তিনি বলেন, 'হরিজনরা শিক্ষিত হলেই তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমে আসবে। এ ব্যাপারে তখন কাউকেই কিছু বলতে হবে না।' হরিজনরা বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন সম্পর্কেও কিছু জানেন না। উপমা জোর দিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের এমনিতেই তেমন কোন প্রয়োগ নেই। আর হরিজনরা ওই আইনের কথা একদমই ভাবেন না। বাল্যবিবাহ যে একটি অপরাধ এবং তা নিষিদ্ধ করে কঠোর আইন দেশে প্রচলিত রয়েছে সে কথাই হরিজনদের অনেকে জানেন না।'

উল্লেখ্য যে, বাল্যবিবাহ বিষয়ে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণায় থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন (১৯৯৮)' শীর্ষক প্রকাশনায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক নারীরই যখন বিয়ে হয় তখন তাদের বয়স থাকে ১৮ বছরের নিচে। বাল্যবিবাহের কারণে অনেক মেয়েই পড়াশুনা শেষ করতে পারে না। বাল্যবিবাহের ফলে অনেক মেয়ে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণে বাধ্য হয় এবং দেশের ২০ শতাংশ মেয়ে ১৫ বছর বয়সের আগে সন্তান জন্ম দেয়। আর ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভবতী হওয়ার ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়। ওই সব ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে–নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া, খুব কম ওজন নিয়ে শিশুর জন্ম নেওয়া, প্রসবের সময় মা ও শিশু দুজনেরই মৃত্যুর আশঙ্কা এবং জন্মের প্রথম বছরেই শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা।' অথচ বাল্য বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

নিরোধ আইন ১৯২৯ (সকল ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অনুযায়ী, নাবালিকা/নাবালক বিবাহ করা অথবা বাল্যবিবাহে সাহায্য করা অপরাধ। এই আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সের ছেলে শিশু হিসেবে গণ্য। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে তিন ধরনের অপরাধ চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা : (১) প্রাপ্ত বয়স্কের সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিবাহ (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিবাহ (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের মা-বাবা বা অভিভাবক কর্তৃক তার বিবাহ নির্ধারণ অথবা এরকম বিবাহে সম্মতিপ্রদান করা। এই আইনে বাল্য বিবাহ বাতিল হয় না; কিন্তু যারা এ ধরনের বিবাহ সম্পাদনে জড়িত থাকবেন (সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত) তাদের সকলেরই কারাদণ্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয়প্রকার দণ্ড হতে পারে। উপমা দাস আক্ষেপ করে বলেন, 'আমাদের হরিজন সমাজের মেয়েদের বেশিরভাগই এসব কিছু জানেন না।'

হরিজন সমাজে মেয়েদের নিয়ে আরও এক ধরনের বিড়ম্বনা রয়েছে। সাধারণত বিয়ে হলে মেয়েদের বাবারবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার কথা। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি হয় মেয়েদের নিজেরবাড়ি। কিন্তু হরিজন সমাজে অনেক মেয়েকে বিয়ের পরও বারারবাড়িতে থাকতে হয়। এর কারণ অন্য কিছু নয়, আবাসন সঙ্কট। বাড়ি-ঘর না থাকায় অনেক ছেলে বিয়ের পর স্ত্রীকে নিজেরবাড়িতে নিতে পারেন না। ফলে বিয়ে হয়ে গেলেও মেয়ে তার বাবা-মার সঙ্গেই থেকে যান। এই সমস্যা দিন-দিন প্রকট হলেও করার কিছুই নেই। বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, 'থাকার ব্যাপারে দু'চারজন ছাড়া সবার একই অবস্থা। সবাই থাকি ছোট্ট-ছোট্ট ঘরে। সে কারণে অনেক ছেলেই বিয়ে করে বৌকে ঘরে তুলতে পারেন না।'

অন্যদিকে হরিজন সমাজে বিয়েতে যৌতুক নেয়া-দেয়া চলে প্রকাশ্যে। যৌতুক ছাড়া কোন মেয়ের বিয়ে হয় না বললেই চলে। আর ওই যৌতুক দেওয়ার জন্য দরিদ্র বাবা-মায়েদের সহায়-সম্বল হারানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হরিজনরা

৭.১ শিক্ষাহীনতা :

গণকটুলী হরিজন কলোনীর গৃহবধূ রূপা একসময় স্বপ্ন দেখতেন যে, পড়াশোনা করে বড় চাকুরী করবেন। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক দু'দিকের প্রতিবন্ধকতাই তার সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। রূপার পড়ালেখা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ২০০৭ সালে আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলে তিনি অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এর পরপরই তার বিয়ে হয়ে যায় কলোনীর অজিত রবিদাসের সাথে। বিয়ের পর আর রূপার পড়ালেখা এগোয়নি। রূপা জানান, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে এসে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখালে রূপাকে আবার আজিমপুর গার্লস স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। কলোনীর অনেকেই তখন আপত্তি তোলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, 'হরিজন সম্প্রদায়ের মেয়েদের লেখাপড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। ওই শিক্ষা কোন কাজে আসবে না।' এক পর্যায়ে রূপার শ্বশুর বাড়ির লোকজনও সেই কথায় সায় দিয়ে রূপাকে স্কুলে যেতে নিষেধ করেন। সেই থেকে রূপার আর লেখাপড়া করা হয়নি। তার কোলে এখন আড়াই বছরের একটি ছেলে। অতীত স্মৃতি হাতড়িয়ে রূপা বলেন, 'ছাত্রী জীবনের কথা মনে পড়লে খুব কষ্ট লাগে। স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার। ঝাড়ুদারি চাকুরী করার কথা কখনও ভাবিনি।' রূপা তার এই অবস্থার জন্য হরিজন সমাজের লোকজনের পশ্চাৎমুখী চিন্তা-ভাবনাকেই দায়ী করেন।

হরিজন সমাজে রূপার মত শিক্ষা বঞ্চিত বহু ছেলেমেয়ে শুধু অভিভাবকদের অবহেলার কারণে নিজেদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারছে না। হরিজনদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা সচেতনতার মারাত্মক অভাব। শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টিকে তারা এখনও তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না। তবে আশার কথা, ইদানিং গণকটুলীর কলোনীগুলোর অনেক ছেলে-মেয়েই স্কুলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে গণকটুলী হরিজন কলোনীগুলোর কাছেই অবস্থিত 'গণকটুলী হরিজন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, 'গণকটুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়', 'ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুল' তিনটির ভূমিকা অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

হরিজন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তারা বাইরের সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তারা লেখাপড়া করতে গেলেই দেখা দেয় নানা সমস্যা। যেমন : নিচুজাতের মানুষ বলে অনেক স্কুলে হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুদের ভর্তি করানো হয় না, স্কুলে ভর্তি হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অ-হরিজন ছাত্র-শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করেন না ইত্যাদি।

গণকটুলী হরিজন কলোনীর বাসিন্দা মালা রাণী দাস বলেন, 'আমাদের ইচ্ছা হয় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাই, কিন্তু সে সুযোগ তো পাই না। সুইপারের কাজ করি বলে মানুষ আমাদের ঘৃণা করে। ভদ্র সমাজের মানুষ আমাদের মানুষ মনে করে না।'

হরিজন বিপুল হাড়ি বলেন, 'প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত গণকটুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ আছে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর বেশি তো আর সেখানে পড়ানো সম্ভব হয় না। তাই একটা সময়ের পরে গিয়ে বাইরের স্কুলে ভর্তির জন্য যেতেই হয়। সমস্যা হয় তখনই। হরিজন বলে অনেক স্কুলেই আর ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে চায় না। বেশিরভাগ স্কুল কর্তৃপক্ষই বলে, সুইপারের ছেলে-মেয়ে ক্লাশে থাকলে অন্যদের অসুবিধা হয়। অনেকেই তাদের সঙ্গে মিশতে পারে না। ফলে লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষিত লোকজন যখন এ ধরনের কথা বলেন তখন আমাদের আর কিছুই বলার থাকে না।'

সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী মাহমুদা চৌধুরী বলেন, 'পরিবেশ নষ্টের দোহাই দিয়ে কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি না করান তবে সেটা হরিজনদের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কেননা সংবিধানের ২৮(৩) নং ধারায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।'

গণকটুলী সুইপার কলোনীগুলোতে গিয়ে দেখা গেছে, হরিজনদের মধ্যে লেখাপড়ার ব্যাপারে রয়েছে চরম অনাগ্রহ। তাদের ধারণা হল, এই সম্প্রদায়ের শিশুদের লেখাপড়া করে কোন লাভ নেই। কারণ

Dhaka University Institutional Repository

যতই লেখাপড়া করুক শেষ পর্যন্ত তাদেরকে চৌদ্দপুরুষের সেই 'ঝাড়ুদারি' পেশাটিই গ্রহণ করতে হবে। তাই টাকা-পয়সা খরচ করে লেখাপড়া করানো অযথা। আবার অনেক বাবা-মা মনে করেন ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হলে পৈত্রিক পেশাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে এবং একসময় হরিজন সমাজ ত্যাগ করে চলে যাবেন। তাই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো যাবে না। আরেক শ্রেণীর অভিভাবক মনে করেন, ঘুষ ছাড়া ভদ্র ঘরের ছেলে-মেয়েরাই যেখানে চাকুরী পান না সেখানে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন না। যোগ্যতা অনুযায়ী কখনোই তারা চাকুরী পাবেন না। মূলত এসব ভাবনা-চিন্তা থেকেই হরিজন কলোনীর বাবা-মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহবোধ করেন না।

কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছেন হরিজনরা। লেখাপড়া না থাকার কারণে সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাপ্য চাকুরী থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, এখন কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদারের চাকুরী নিতে গেলেও অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট দরকার হয়। কিন্তু হরিজন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের সেই যোগ্যতা নেই। তাই বর্তমানে ঝাড়ুদারের চাকুরীও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, দারিদ্র তাদের শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়। দারিদ্রের কারণেই হরিজন ছেলে-মেয়েরা স্কুলে না যেয়ে কাজের সন্ধানে বের হয়। বাবা-মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে দু'পয়সা রোজগারে পাঠিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সদস্য সুবল চন্দ্র দাস বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে হরিজনদের অধিকার সমান। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা সমান সুযোগের দাবীদার। সমস্যা হল, শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে তারা নিজেরাই তেমন সচেতন না। ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। তাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিৎ।' তিনি আরও বলেন, 'হরিজনদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে তাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের দরকার রয়েছে। এই পরিবর্তন করা গেলে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এমনিতেই দূর হবে।'

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস হরিজন শিশুদের প্রসঙ্গে বলেন, 'দেশের অন্যান্য শিশুদের মতো হরিজন শিশুদেরও লেখাপড়া শেখার সমান অধিকার রয়েছে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে পরিবর্তন আসবে হরিজনদের জীবন ধারায়।'

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ চিকিৎসা সমস্যা :

স্বাস্থসেবার সঙ্কট গণকটুলী হরিজন কলোনীগুলোতে একটি বড় সমস্যা। পুষ্টিহীনতার শিকার এখানকার শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু। এখানে শিশু মৃত্যুর হারও অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি। পেটের পীড়া, ডায়রিয়া, আমাশয় যেন এখানকার প্রতিটি মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রত্যেক পরিবারে একজন-দুজন লোক সবসময়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন। হরিজন কলোনীর বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'তারা সরকারের দেয়া স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। নিচুজাতের মানুষ বলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের কলোনীতে আসে না। সুইপার হওয়ায় অনেকে চিকিৎসা করতেই রাজি হন না। অস্পৃশ্যতা ও নিচু জাতের অজুহাত দিয়ে অনেক ডাক্তার তাদের অবহেলা করেন।' গণকটুলীর হরিজন নবীন চন্দ্র দাস বলেন, 'তৃতীয়সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় আমার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে হাসপাতালে নেয়ারও সময় ছিল না। বাইরে থেকে একজন ডাক্তার আনতে গেলে হরিজন কলোনীর কথা শুনে তিনি আসতে রাজি হননি। সুইপার বলে বিপদের দিনেও আমরা কাউকে কাছে পাই না। এসব দুঃখ-কষ্টের কথা কখনও কোন সংবাদপত্রে ছাপা হয় না।'

গণকটুলী সুইপার কলোনীর নোংরা পরিবেশই হরিজনদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে অনেকেই নিজেকে ঠিকমত পরিষ্কার রাখেন না। আর সে কারণে তারা ঘন ঘন রোগাক্রান্ত হন। হরিজন বিজয় দাস বলেন, 'পোলিও বা অন্যান্য টিকা খাওয়াতে যারা আসেন তারা অনেক সময় কলোনীর ভেতরে না ঢুকে দূরে কোথাও বসে খবর পাঠান সেখানে যাওয়ার জন্য। খবর পেয়ে কেউ সেখানে যান, কেউ যান না। ফলে সরকারের টিকা খাওয়ানো কর্মসূচি থেকেও হরিজন কলোনীর অনেক শিশু বাদ পড়ে যায়।'

৭.৩ ভাষার অবলুপ্তি :

নিজস্ব ভাষায় কথা বলা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী লোকদের অনেকেরই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। বাংলায় কথা বলার পাশাপাশি তারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন। এমনকি কোন কোন নৃগোষ্ঠীর লোকজন তাদের নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়াও করছেন (যেমন : সাঁওতাল)। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল, হরিজনদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও তারা তা ভুলে যাচ্ছেন। চর্চা না থাকাই এর মূল কারণ বলে জানান হরিজনরা।

Dhaka University Institutional Repository

হরিজনরা সাধারণত তেলেগু ও হিন্দী ভাষী। অনেক বিশেষজ্ঞই মতামত দেন যে, হরিজনদের নিজস্ব ভাষাটি আসলে হিন্দি। তবে তাতে আঞ্চলিকতার প্রভাব রয়েছে। একসময় হরিজন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে এই ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তারা সবসময় এ ভাষাতেই কথা বলতেন। শুধু অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় ব্যবহার করতেন বাংলা ভাষা। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হরিজনদের মধ্যে এখন বাংলা ভাষার প্রচলনই বেশি। অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তো বটেই, নিজেদের মধ্যেও তারা এখন বাংলাতেই বেশি কথা বলেন। কিন্তু কেন? ঢাকার গণকটুলী হরিজন কলোনীর বাসিন্দা মিঠাই লাল বলেন, 'এমনিতেই আমরা অচ্ছুত। তার ওপর যদি নিজস্ব ভাষায় কথা বলি তবে মানুষ আমাদের আরও নোংরা ভাববে। আমাদের চৌদ্দ পুরুষের যে নিজস্ব ভাষা সেই ভাষা এখন আমরা ইচ্ছে করেই ভুলে যাচ্ছি। ও ভাষায় আমরা আর কথা বলিনা। কারণ ওই ভাষায় কথা বললে ভদ্রসমাজ আমাদেরকে এড়িয়ে চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিগৃহীত হতে হয়। যেমন : একবার আমি আর আমার ভাই একটি হোটেলে বসে কথা বলছিলাম আর খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে হোটেলের ম্যানেজার এসে 'সুইপারের বাচ্চা' বলে গালি দিয়ে আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। আমরা তখন একটি কথাও বলতে পারিনি। আমাদের কি অপরাধ তা জিগ্যেস করারও সুযোগ পাইনি। তবে পরে বুঝতে পেরেছিলাম কথা শুনে হোটেলের লোকজন বুঝে গিয়েছিল যে আমরা হরিজন। তাই পারতপক্ষে নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে চাই না।'

হরিজন রাজিব রবিদাস এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা দুঃখজনক। যে দেশে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করতে যেয়ে মানুষ জীবন দিয়েছে, সে দেশে আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে ভয় পাই। আদিবাসীরা যদি তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে পারে তবে আমাদেরকেও নিজস্ব ভাষায় কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।'

৭.৪ মহাজনদের দৌরাত্ম্য :

হাজারীবাগ এলাকাটি রাজনৈতিকভাবে সবসময়ই সরগরম থাকে। তার একটি রেশ দেখতে পাওয়া যায় গণকটুলী সুইপার কলোনীগুলোর ভেতরেও। বিভিন্ন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কলোনীগুলোতে এক শ্রেণীর মহাজন তৈরি হয়েছে। ওইসব মহাজন দরিদ্র হরিজনদের মধ্যে ঋণ দিয়ে মাসে মাসে মোটা অংকের সুদ নিচ্ছেন। মহাজনরা হরিজন সমাজের আসল চিত্র কাউকে বুঝতে দেন না। নিজেদের স্বার্থে তারা গোটা সমাজকে বঞ্চিত করেন। হরিজনদের বেকারত্বকে পুঁজি করে তারা নিজেরা সুবিধে আদায় করেন। হরিজন কলোনীগুলোয় যাদের অবস্থা একটু ভাল তারা বেশিরভাগই মহাজনী ব্যবসার সাথে জড়িত। তারা চান না দরিদ্র হরিজনরা স্বাবলম্বী হোক।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠন

৮.১ ইতিহাস :

গণকটুলীর হরিজনদের সাথে কথা বলে জানা যায়, হরিজন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা আঞ্চলিক পর্যায়ে গোত্রভিত্তিক কিছু ছোট ছোট সংগঠন তৈরি করে অধিকার আদায় ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাতেন। এতে কেউ সফল হতেন, কেউ হতেন না। এভাবেই চলে আসে আশির দশক পর্যন্ত। একসময় হরিজন সম্প্রদায়ের নেতারা উপলব্ধি করেন যে, তাদেরকে একটি প্লাটফর্মে দাঁড়ানো দরকার। তা না হলে তাদের ওপর যে আঘাত আসছে তা মোকাবিলা করা যাবে না। বিশেষ করে যখন তারা পৈতৃক পেশা থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হতে থাকেন তখন সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হতে একটি প্লাটফর্ম গঠনে উদ্যোগী হন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ১ মে বগুড়ায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা হরিজন নেতাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে ১৬ সদস্যের একটি টুর কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক হন বগুড়ার হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ঘুটু রাম। ওই কমিটি দীর্ঘ সাতবছর সারা দেশের হরিজনদের সঙ্গে বৈঠক করে ঝাড়ুদারি পেশায় অ-হরিজন প্রবেশের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ঝাড়ুদারি পেশায় অ-হরিজনদের প্রবেশের কারণে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে দিন দিন বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে–এ বিষয়টি টুর কমিটি গোটা দেশের হরিজনদের সামনে তুলে ধরেন। পাশপাশি তারা জাতীয় পর্যায়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন। বিভিন্ন গোত্রের হরিজনরা বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং সবাই মিলে জাতীয় পর্যায়ে একটি সংগঠন করতে সম্মত হন। অবশেষে ১৯৯৮ সালের ১০ জুলাই বগুড়া জেলা অ্যাডওয়ার্ড পার্ক টিটো মিলনায়তনে সারা দেশের হরিজন প্রতিনিধিদের একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়। ওই সম্মেলনে গঠন করা হয় বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন ঘুটুরাম হাড়ি। পরে তিনি সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। পরিষদের বর্তমান সভাপতি কৃষ্ণলাল ও মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস। (নিউজ নেটওয়ার্ক, ২০০৪)

Dhaka University Institutional Repository

৮.২ গঠনতন্ত্র :

সারা দেশের হরিজনদের প্রধান চারটি গোত্রীয় সংগঠন এক হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ। সংগঠন চারটি হল–

১. বাংলাদেশ সংযুক্ত হরিজন সংঘ

২. উত্তরবঙ্গ হরিজন ফেডারেশন

৩. বাংলাদেশ বাঁশফোর হরিজন ঐক্য পরিষদ

৪. বাংলাদেশ হেলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।

মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, 'এখন আর আমাদের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই। আমরা সবাই এখন একই কাতারে সামিল হয়েছি। জাতীয় পর্যায় থেকে এদেশের হরিজনদের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি এখন গ্রহণ করা হচ্ছে।'

পরিষদের সভাপতি কৃষ্ণ লাল বলেন, 'সাংগঠনিকভাবে এখন আমরা বেশ শক্তিশালী। আমরা দীর্ঘদিনের অবহেলিত নিগৃহীত আদি পেশার জাত সুইপার হরিজনরা আমাদের মৌলিক চাহিদা এবং মানবাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্য গঠনে সক্ষম হয়েছি। সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে পারলে আমরা জাতীয় পর্যায়ে আমাদের চাওয়া পাওয়া আদায় করতে সক্ষম হব। কারণ সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না।' তিনি আরও বলেন, 'জেলায় জেলায় ঐক্য পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সারাদেশের হরিজনরা একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে চলে এসেছেন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, দাবী দাওয়া এবং করণীয় সম্পর্কে এখন সবাইকে জানানো ও একত্র করা সম্ভব।'

৮.৩ বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের দাবীনামা :

ক) চাকুরী :

১. আদি পেশাজীবী জাত সুইপার হরিজনদেরকে সরকারী-বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রদানের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দিতে হবে।

২. প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় আদি ঝাড়ুদার পেশাজীবী হরিজনদের চাকুরী নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হরিজনদেরকে ঝাড়ুদার পদে নিয়োগ দিতে হবে।

৪. প্রতি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় ঝাড়ুদারদের স্থায়ী নিয়োগ দান করে সরকারী স্কেলের ভিত্তিতে বেতন প্রদান করতে হবে।

৫. বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় বেতন বৈষম্য দূর করে বর্তমান বাজারের প্রতি লক্ষ্য রেখে বেতন কাঠামো গঠন করতে হবে।

৬. সকল সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে হরিজনদের মধ্যে অবসর গ্রহণকারী ও মৃত ব্যক্তির পদে তাদের পরিবারবর্গকে চাকুরীর সুযোগ দিতে হবে।

৭. জাত সুইপার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃত ও আদি পেশাজীবী এই মর্মে সনদ বা প্রমাণপত্র বিহীন অ-হরিজনদের সুইপার পদে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

৮. যে সকল সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে জাত সুইপার নিয়োগ বন্ধ আছে সেখানে অবিলম্বে ওই নিয়ম প্রত্যাহার করে পুনঃ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. জাত সুইপার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করতে হবে।

১০. শিক্ষিত হরিজন সন্তানদের জন্য সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ১০% চাকুরীর কোটা দিতে হবে।

১১. দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরা যে কাজ করেন বা জিনিসপত্র তৈরী করেন তার মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. হরিজন মহিলারা যেন হাতের কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারেন সেজন্য কুটিরশিল্প স্থাপন করতে হবে।

খ) বাসস্থান :

১. যুগ যুগ ধরে হরিজনরা যেসব কলোনী অথবা পল্লীতে বসবাস করছেন সেগুলো তাদেরকে স্থায়ীভিত্তিতে বরাদ্দ দিতে হবে।

২. দেশের প্রতিটি সিটি কলোনী ও পৌর কলোনীর জরাজীর্ণ ভবনগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. প্রয়োজনে নতুন বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। পানীয় জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃপ্রণালী তৈরীসহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

৪. প্রতিটি হরিজন কলোনীর নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ) শিক্ষা :

১. বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত হরিজন সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততিদের অবৈতনিকভাবে শিক্ষার সুযোগ ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যাপীঠ–যেমন : দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে কোটার ভিত্তিতে ভর্তি করিয়ে নিতে হবে।

৩. উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর যোগ্যতা অনুযায়ী হরিজন সন্তানদের চাকুরীর সুযোগ দিতে হবে।

৪. দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পরিচালনা পরিষদে মোট সদস্যের মধ্যে অন্তত দুই শতাংশ হরিজন ঝাড়ুদারদের ভেতর থেকে সরকারীভাবে মনোনয়ন করতে হবে।

ঘ) চিকিৎসা :

প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে অগ্রাধিকারভাবে ঝাড়ুদার হরিজনদের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। জটিল কোন রোগ হলে সরকারী চিকিৎসা দিতে হবে।

ঙ) কল্যাণ :

১. ঝাড়ুদার হরিজনদের কল্যাণার্থে হরিজন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। ট্রাস্ট পরিচালনায় হরিজন প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে হবে।

২. মাতৃভূমি স্বাধীন করতে যেসব হরিজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন এবং যারা এখনও বেঁচে আছেন সরকারীভাবে তাদের মূল্যায়ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তাদের নাম প্রকাশ করতে হবে।

৩. শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার পরিজনকে সরকারীভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

৪. বয়স্ক ভাতা প্রদানের বিষয়টি হরিজনদের মধ্যেও চালু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

মাঠকর্মের আনন্দ-বেদনা

গণকটুলীর হরিজনদের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় বিএসএস (সম্মান) তৃতীয়বর্ষে অধ্যায়নকালে। কোর্স ৩০২ এর অংশ হিসেবে হরিজন সমাজের মানুষদের নিয়ে আমাকে একটি রিপোর্ট তৈরী করতে হয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিএসএস (সম্মান) শেষবর্ষে অধ্যায়নকালে কোর্স ৪০২-Research Methodology and Monograph এর অংশ হিসেবে আমাকে একটি মনোগ্রাফ করতে হয়। মনোগ্রাফে আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'হরিজন এবং তাদের জীবন : গণকটুলীর বংশ পরম্পরায় পেশাজীবী হরিজনদের ওপর একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা।' এই গবেষণা করার সময় আমি হরিজনদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই। যা পরবর্তীকালে আমাকে এম.ফিল. গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

গবেষণা চলাকালে হরিজন কলোনীগুলোতে আমি নিয়মিত যাতায়াত করেছি। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে কলোনীর বাসিন্দাদের আনন্দ-বেদনাগুলো অনুভব করতে চেষ্টা করেছি। তাদের এই আনন্দ-বেদনার ভাগীদার হতে গিয়ে আমার নিজস্ব কিছু মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে। যেগুলো আমি আমার ক্ষেত্র গবেষণার আনন্দ-বেদনা হিসেবে ধরে নিয়েছি। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হল।

হরিজন কলোনীগুলোতে কাজ করার সময় আমার একজন সহকারী ছিল। তার নাম রাজিব রবিদাস। হরিজন কলোনীতে জন্মগ্রহণ করেও সে পড়াশোনায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সরকারী কবি নজরুল কলেজে পড়ার সাথে সাথে রাজিব হরিজন কলোনীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করত। বহুদিন কলোনীর ১০ বর্গফুটের ঘরগুলো এবং আশেপাশের ঝুপড়ি ঘরগুলোতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের পর আমি রাজিবের বাড়ি গিয়েছি, তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এক সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছি, মিলেমিশে তাদের পরিবারেরই একজন হতে চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য, আমি গণকটুলীর হরিজন পরিবারগুলোর কাছে গবেষক নয় বরং বন্ধু হতে চেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

গণকটুলীর হরিজন কলোনীর বাসিন্দা রাজিব রবিদাসকে বন্ধু হিসেবে পাওয়াও আমার জীবনের একটি বড় প্রাপ্তি।

মাঠকর্মে অবস্থানকালে আমার সাথে কিছু জিনিসপত্র থাকত। যেগুলোকে আমার বন্ধুরা নাম দিয়েছিল Horishishu's Staffs. যেমন : একটি নোট খাতা, কালির কলম, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি। আমি আমার প্রয়োজন অনুসারে এগুলো ব্যবহার করতাম।

মাঠকর্মের একদিনের ঘটনা আমার খুব মনে পড়ছে। সেদিন আমার সাথে রাজিব রবিদাস ছিল না। একা একা ছবি তোলার ফাঁকে কলোনীর কিছু ছেলে আমাকে ঘিরে ফেলে। আমি আমার গবেষণার একটি জায়গায় উল্লেখ করেছিলাম, হরিজন কলোনীতে মাদক ব্যবসার সাথে বেশিরভাগ বয়স্ক মহিলারা জড়িত। সেই উদ্দেশ্যে তাদের কিছু ছবি তোলার সময় আমার উপর চড়াও হয় ছেলেগুলো। হতে পারে ছেলেগুলো বয়স্ক মহিলাগুলোর মাদক ব্যবসার সহকারী যারা ক্রেতার কাছে মালামাল হস্তান্তর করে। চড়াও হওয়ার পরে তারা আমাকে তাড়া করে এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ৫নং গেট পর্যন্ত নিয়ে আসে। এমন সময় আমার পূর্বপরিচিত 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকার ক্রীড়া প্রতিবেদক তপন আমাকে তাদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেন। আমার ক্ষেত্র গবেষণার এটি একটি মনে রাখার মত ঘটনা।

মূলত এভাবেই আমার প্রায় নয় মাসব্যাপী গবেষণা শেষ হয়। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে সামগ্রীকভাবে গণকটুলী হরিজন কলোনীতে আমার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আনন্দের, বৈচিত্রের ও অভিজ্ঞতায় ভরপুর। যে ভালবাসা আমি তাদের কাছে পেয়েছি তা সারাজীবন মনে রাখার মতন। আমি মনে প্রাণে এই অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলোর উন্নয়ন কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

উপসংহার ও সারমর্ম

যুগ যুগ ধরে হরিজনরা অবহেলিত আর অবজ্ঞার পাত্র। বর্তমানে তারা একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার পরেও তারা নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। হাজার হাজার হরিজন পরিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত হরিজন কলোনীগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। গণকটুলীর হরিজনরা তার ব্যতিক্রম নয়। তারা সমাজকে পরিষ্কার করে রাখলেও নিজেরা থাকছে অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জি পরিবেশের মাঝে। যুবসমাজ লেখাপড়ার বদলে মাদক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে আছে। পৈত্রিক পেশা হারানোর ভয়, বিকল্প পেশার সন্ধানে গিয়ে না পেয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি সকল কিছুই তাদেরকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে ভাল ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করাও তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে।

হরিজনরা সমাজের অন্তরালের মানুষে পরিণত হয়েছে। হরিজন কলোনীগুলোতে আমার গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, কিভাবে তারা মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত তা অনুসন্ধান করে দেখা, কিভাবে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

হরিজন কলোনীগুলোতে পাওয়া গেছে তাদের বাসস্থানের স্বল্পতা, খাদ্যভ্যাসের দূরবস্থা, রোগব্যাধির বিস্তার, যুবক সম্প্রদায়ের বিপদথগামী হওয়ার কাহিনী। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গবেষণাও হয়েছে সীমিত। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাদের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন কখনও হয়নি। কোন সরকারই তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেনি। স্বাধীনতার ৪১ বছর পরও তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার বঞ্চিত।

হরিজনদের অধিকারগুলো প্রকাশ করতে তারা হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠন করেছে। চাকুরী, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার দাবী-দাওয়া তুলে ধরেছে। কিন্তু তারপরেও তাদের আহ্বানে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খুব একটা সাড়া দিচ্ছে না।

আমার গবেষণার মাধ্যমে যদি তাদের জীবনের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে তাহলে আমার গবেষণা সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী : ১

প্রশ্নমালা

১. নাম কি?

২. বয়স কত?

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু?

৪. কোন পেশায় নিয়োজিত?

৫. কর্মস্থল কোথায়?

৬. কতদিন হল বিয়ে করেছেন?

৭. গৃহকর্ত্রীর নাম কি?

৮. গৃহকর্ত্রীর বয়স কত?

৯. গৃহকর্ত্রী কোন পেশায় নিয়োজিত?

১০. গৃহকর্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

১১. পরিবারে সন্তানসংখ্যা কত?

১২. সন্তানের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা (যদি থাকে) কি?

১৩. সন্তান বিবাহিত না অবিবাহিত?

১৪. দৈনন্দিন খাবারের ধরন কি রকম? রন্ধন-প্রণালী কি প্রকৃতির?

১৫. বাসস্থান কেমন?

১৬. নিজের কোন বাসস্থান আছে কি না?

১৭. একেকটি ঘরে কয়জন থাকে?

১৮. পরিবার প্রতি ঘরের সংখ্যা কত?

১৯. পয়ঃনিষ্কাষণ প্রণালী, স্যানিটেশন ব্যবস্থা কি ধরণের?

২০. পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কি প্রকৃতির?

২১. আসবাবপত্র কি ধরনের?

২২. পোশাক-পরিচ্ছেদ কেমন ধরনের?

২৩. বছরে কয়বার কাপড় কেনে?

২৪. পরিবারের সদস্যরা কি কি কাজে জড়িত?

Dhaka University Institutional Repository

২৫.পরিবারে কেউ বেকার আছে কিনা?

২৬.বেকারত্বের অবস্থান কেমন?

২৭.পেশার প্রকৃতি কেমন?

২৮.আয়-ব্যয় কি পরিমাণ কেমন?

২৯.আয়-ব্যয়ের সঞ্চয়, সুবিধা-অসুবিধা কেমন?

৩০.আয় ব্যয়ের খাতগুলো কি?

৩১.আয় ব্যয়ের খাতগুলোতে নারী-পুরুষের বৈষম্য আছে কিনা?

৩২.কোন সংগঠন বা সমিতি করে কিনা?

৩৩.কি ধরনের অসুখ বেশি হয়?

৩৪.কি ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করে?

৩৫.চিকিৎসার জন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেখানে আছে কিনা? থাকলে তারা কি ধরনের সেবা প্রদান করে?

৩৬.হরিজনরা কোন সেবাটি অধিকতর গ্রহণ করে থাকে?

৩৭.সেবার মান সম্পর্কে তাদের অভিমত কি?

৩৮.হরিজনদের জাতপেশা ঝাড়ুদারি সম্পর্কে তাদের কি ইতিহাস জানা আছে?

৩৯.ঝাড়ুদারি পেশায় হরিজনরা কি করে এলেন?

৪০.বর্তমানে পরিবারের ধরন কি রকম?

৪১.আগে পরিবারের ধরণ কি রকম প্রচলিত ছিল?

৪২.অবসর সময়ে কি করে?

৪৩.বিয়ের সময় যৌতুক দেয়া-নেয়া হয় কিনা?

৪৪.বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর মতামত গৃহীত হয় কিনা?

৪৫.কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত কি না?

৪৬.ভোট প্রদান করে কিনা?

৪৭.নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিতে পারে কিনা?

৪৮.নিজেদের কোন সংগঠন অথবা সমিতি আছে কিনা?

৪৯.সংগঠনের গঠন প্রণালী, কার্যক্রম, সফলতা, বিফলতা কি?

৫০. বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের সদস্য হিসেবে গণকটুলীতে বসবাসরত পেশাজীবী হরিজনদের দাবী দাওয়াগুলো কেমন?

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী : ২

গবেষিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ

গণকটুলী হরিজন কলোনীগুলোতে আমি একটি প্রশ্নমালা নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন বিভিন্ন পরিবারে গিয়ে একক কিংবা সমবেতভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন এই প্রশ্নমালা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। তথ্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে দেওয়া হল।

১. অধিকাংশ হরিজন দৈনন্দিন খাবার হিসেবে ভাত, সবজি, ছোট মাছ খায়।

২. মাসে ২-৩ দিন মাংস খায়। মুরগির মাংস বেশি খাওয়া হয়।

৩. হরিজনরা শুকর খায়।

৪. রন্ধন প্রণালী সাধারণ।

৫. সাধারণ বাঙালী সমাজের মতই মশলা ব্যবহার করে।

৬. প্রত্যেক পরিবারের বাসস্থান ১০ বর্গফুটের একটি কক্ষ। সাথে লাগোয়া রান্নাঘর। এর মাঝেই পরিবারের সকল সদস্য বসবাস করে।

৭. পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশিরভাগ পরিবারে পাঁচের অধিক।

৮. প্রত্যেক পরিবার প্রতি আলাদা কোন টয়লেট নেই। কলোনীগুলোতে সকলের কমন টয়লেট। আড়াইশ মানুষের জন্য গড়ে একটি করে টয়লেট রয়েছে।

৯. আসবাবপত্র অধিকাংশই কাঠের।

১০. পোশাকের মধ্যে শাড়ি, সেলোয়ার কামিজ পড়ে মেয়েরা। পুরুষরা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, ধূতি পড়ে।

১১. বছরে হরিজনরা দূর্গা পূজায় এবং অন্যান্য পার্বণে কাপড় কেনে।

১২. গণকটুলীর হরিজনরা বেশিরভাগই পেশায় ঝাড়ুদার।

১৩. প্রত্যেক পরিবারের মাথাপিছু আয় গড়ে ৩৫০০-৪০০০ টাকা। ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই থাকে না।

১৪. যুবক সম্প্রদায়ের অনেকেই বেকার। অনেকে লেখাপড়া শেখার কারণে ঝাড়ুদারি কাজ করতে চায় না। আবার অফিস আদালতেও কাজ পায় না।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. তাদের সংগঠন বলতে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ।

১৬. শিশুরা বেশির ভাগ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকেন।

১৭. কলোনীতে ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। সরকারী-বেসরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র সেখানে নেই। তবে সরকারী ঝাড়ুদাররা সরকারী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করে।

১৮. অধিকাংশ পরিবারই একপত্নীক।

১৯. একটি ঘরেই বিয়ের পর বাবা-মা, ভাই-বোন, সকলে বসবাস করেন। ছেলে বিয়ে দিলে ঘরের মাঝখানে পার্টিশন ব্যবহার করে।

২০. অবসর সময়ে পরিবারের সকলে মিলে টেলিভিশন দেখে। হিন্দী সিনেমা অথবা সিরিয়ালগুলো এখানে খুব দেখা হয়।

২১. যৌতুক বেশি মাত্রায় গ্রহণ করা হয়।

২২. পূর্বে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামত গ্রহণ করা না হলেও বর্তমানে পাত্রপাত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২৩. দূর্গাপূজা, অন্যান্য পার্বণ ইত্যাদিকে সাড়ম্বরে পালন করা হয়।

২৪. যে সকল হরিজন ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করেন তাদের অধিকাংশই 'গণকটুলী হরিজন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়', 'গণকটুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়', 'ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুল' এ লেখাপড়া করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী : ৩

কেস স্টাডি

কেস স্টাডি	:	১
নাম	:	রত্না রাণী
বয়স	:	২৩ বছর
পদবী	:	ঝাড়ুদার
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৫ম শ্রেণী পাশ
কর্মস্থল	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল
ওজন	:	৪৮ কেজি
উচ্চতা	:	৫ ফুট ১ ইঞ্চি

রত্না রাণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন গণকটুলী হরিজন কলোনীতে। জন্মের পর দাদাকে দেখেছিলেন ঝাড়ুদারির কাজ করতে। পরে বাবাকে দেখেছেন। অন্যান্য বড় ভাইবোনদেরও দেখেছেন, এখন নিজেই করছেন। আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। চরম অর্থনৈতিক কষ্টের মাঝেও রত্নার বাবা চেষ্টা করেছিলেন ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে। সাত ভাই-বোনের সকলে প্রথম জীবনে স্কুলে যাওয়া শুরু করলেও একে একে সবাই ঝরে পড়ে। রত্না প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করে আর পড়ালেখা করেনি। ভাই-বোনদের কাজে সাহায্য করতে নেমে পড়ে। সাত সন্তানসহ নয় সদস্যের পরিবারটির মুখের খাবার জোগাড় করতে রত্নার বাবার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। ছেলে-মেয়েরাও বুঝতে পারে হরিজন সমাজে দুবেলা মুখের ভাত যোগাড় করা কতটা কঠিন। তাই আস্তে আস্তে তারাও কাজে মনোযোগ দেয়।

রত্নারাণীর বিয়ে হয় ১৬ বছর বয়সে। রত্নার স্বামী কানাই বাঁশফোড়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার পদে কর্মরত। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই রত্নার সন্তান জন্মদান শুরু হয়। বর্তমানে রত্নার সন্তানসংখ্যা তিনজন। দুই মেয়ে এক ছেলে। গণকটুলী সুইপার কলোনীর ১০ বর্গফুট কক্ষে শ্বাশুড়ী, ননদ, স্বামী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে বসবাস করে রত্না। ঘরটির আসবাব বলতে শ্বশুরের ব্যবহৃত পুরনো একটি খাটিয়া, একটি টেবিল, দুটো চেয়ার এবং বিয়ের সময় বাবারবাড়ি থেকে যৌতুক হিসেবে পাওয়া কিছু আসবাব। রত্না ও তার স্বামী কানাইয়ের মাসিক গড় আয় ৪৫০০ টাকা। এই দিয়েই অভাবেব সংসার চলে।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র দুই বছরের ব্যবধান নিয়ে বারবার সন্তান জন্মদান করার ফল খুব একটা ভাল হয়নি। রত্না বেশিক্ষণ পরিশ্রম করতে পারেনা। হাঁপিয়ে ওঠে। তাছাড়া রত্নার সবসময়ই মাথাব্যথা থাকে। প্রায়ই বমি হয়। হাতে, পায়ে পানি জমে। রত্নার তিনসন্তানও অপুষ্টির শিকার। অধিকাংশ সময়ই তারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকে। ডায়রিয়া তাদের প্রতিদিনের রোগ। সন্তানগুলোর শরীর শুকনো হলেও পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। এভাবেই তারা বেঁচে আছে।

এরমধ্যে রত্নার ননদের বিয়ে দেয়া নিয়ে পরিবারে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মেয়েটির জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

রত্নার পরিবারে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভাত, রুটি, সবজি ইত্যাদি খাওয়া হয়। মাংস প্রায় হয় না বললেই চলে।

রত্না চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে তার কর্মস্থল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল থেকে। প্রতিদিন বিনা পয়সার ওষুধ রত্না এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিত্যসঙ্গী। জাতপেশা ঝাড়ুদারিতে রত্না রাণী সন্তুষ্ট না হলেও বর্তমানে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে।

রত্না রাণী বলেন, 'অভাবের সংসার আমার। অভাবের কারণে নিজে বেশিদূর পড়ালেখা করতে পারিনি, সন্তানগুলোকেও ঠিকমত পড়াতে পারছি না। ছেলে-মেয়েগুলো বেশিরভাগ সময় অসুস্থই থাকে। ভগবানই আমাদের প্রতি সদয় নন, মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ কি! মাঝে মাঝে নিজেকে এত অসহায় মনে হয়! ভাগ্যকে মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ভোর বেলা কাজে যায় রত্না। শ্বাশুরী রত্নার সন্তানগুলোকে লালন-পালনের গুরু দায়িত্ব পালন করে। হাসপাতালের মেঝে ঝাড় দিয়ে, রোগীদের নানারকম ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে রত্নার সারাদিন কেটে যায়। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আবার রাতের রান্না করতে বসে।

প্রতিদিনের কাজের রুটিনে তেমন কোন ব্যতিক্রম নেই রত্নার। আক্ষেপ করে রত্না বলেন, 'নিচুজাতে জন্মগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমার কোন ভূমিকা নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, জন্মের পর হতে আমরা একটি কারাগারের ভেতরে আছি। আমাদের মুক্তির সকল পথ ভগবান রুদ্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, ভাল থাকার অধিকার নেই।'

রত্না রাণীর প্রতিটি কথায় হরিজনদের জীবনযাত্রার নির্মম বেদনা ফুটে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি	:	২
নাম	:	সুবল চন্দ্র দাস
বয়স	:	৫২ বছর
পদবী	:	ঝাড়ুদার
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৮ম শ্রেণী পাশ
কর্মস্থল	:	পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ওজন	:	৭৮ কেজি
উচ্চতা	:	৫ ফুট ৪ ইঞ্চি

সুবল চন্দ্র দাস বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা সম্পাদক। বংশ পরম্পরায় ঝাড়ুদারি পেশায় নিয়োজিত। সুবলের কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট। জীবনের প্রথম কর্মজীবনই শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাড়ুদার হিসেবে।

সুবলের স্ত্রী ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার। ঘুম থেকে উঠেই ঝাড়ু হাতে বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে। সারাদিন কাজ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়।

বিয়ের পর তাদের ঘরে একে একে তিনটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। গণকটুলী সুইপার কলোনীর দ্বিতীয় তলায় ১০ বর্গফুটের একটি কক্ষে সুবল তার পরিবার নিয়ে বসবাস করত। গণকটুলী হরিজন কলোনীর অন্যান্য সুইপারদের চেয়ে সুবলের অবস্থা অনেকটা ভাল। সুবলের বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সারাজীবন অভাবের সাথে লড়াই করে যে টাকা সুবল সঞ্চয় করেছিল তাই দিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দেয় সে। বড় মেয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কলোনীর ভেতর ভাল ছেলে দেখে বিয়ের আয়োজন করে সুবল। মেজো মেয়েটি ইডেন কলেজে ইতিহাস নিয়ে অনার্স পড়ছে দ্বিতীয়বর্ষে, ছোট মেয়েটি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে নবম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত। নিজে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও মেয়েদেরকে পড়ালেখা করাচ্ছে সে।

কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত একটি কোয়ার্টার পেয়েছে সুবল। আরও আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত কোয়ার্টার পেতে পারত সে। কিন্তু গণকটুলীর মায়া সুবল ছাড়তে পারেনি। কিন্তু মেয়ের বিয়ের পর স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে উঠেছে সে। তবে গণকটুলীর ১০ বর্গফুটের ঘরটি বড় মেয়েকে দিয়ে এসেছে। বিয়ের পর সুবলের বড় মেয়ে ঐ ঘরেই প্রথম সংসার শুরু করে। বহু বছর আগে একই ঘরে সুবলও সংসার শুরু করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সুবল ও তার পরিবার চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার থেকে। বর্তমানে বাকি দুই মেয়ের লেখাপড়ার খরচ এবং ভবিষ্যতে মেয়েদের বিয়ের খরচের কথা চিন্তা করে গভীর চিন্তায় পড়ে সে।

আক্ষেপ করে সুবল বলেন, 'কি বলব বাবু! এই জীবন মানুষের জীবন নয়। সারাজীবন শুধু মাথায় করে ময়লাই বয়ে নিয়ে গেলাম। তবে আমি খুশি যে, মেয়ে তিনটা'কে কিছুটা হলেও পড়ালেখা করাতে পেরেছি। বড় মেয়েটি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও স্বনির্ভর। কম্পিউটারের কোর্স করেছে। এখন একটা কাজও পেয়েছে। মেজো মেয়েটি ইডেনে পড়ছে। ছোটটিও ছাত্রী ভাল। হরিজনদের জীবন কষ্টে ভরা। জীবনে আমরা তেমন কিছুই পাই না। এরমধ্যেও পরম পাওয়া যে, আমি গর্ব করে বলতে পারি, আমার একটি মেয়ে অনার্স পড়ে।'

খাওয়া-দাওয়ার দৈনন্দিন তালিকায় ছোট মাছ থাকে অধিকাংশ সময়ই। সবজি খাওয়া হয় বেশি। অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল থাকার কারণে মাংস খুব একটা খাওয়া হয় না।

সুবল আরও বলেন, 'পড়ালেখা করার পাশাপাশি মেয়েদের নানা বায়না। সবসময় সবকিছু দিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করে যে টাকা রোজগার করি তার বেশিরভাগই বাড়ি ভাড়া বাবদ কেটে নেওয়া হয়। বৌ যে টাকা রোজগার করে তা দিয়ে কোনরকমে দিন কেটে যায়। আরও দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি আছে। জানিনা কিভাবে যৌতুকের টাকা যোগাড় করব!'

কলোনীর বাইরে একবার জায়গা কেনার কথা ভাবছিল সুবল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি সুবলের। হরিজন বলে কেউ তার কাছে জায়গা বিক্রি করেনি। দু:খের সাথে সুবল বলেন, 'একসময় কলোনীর বাইরে একটি জমি কিনতে চেয়েছিলাম, বায়নার টাকাও দিয়েছিলাম। জমি বিক্রেতা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে জমি বিক্রি করতে রাজি হয়নি। কারণ, হরিজনকে প্রতিবেশী না করার জন্য আশেপাশের লোকজন তার ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিল। বিক্রেতা বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল। জমি কিনতে না পেরে আমার আর কলোনী ছেড়ে বাইরে বসবাস করার সুযোগ হয়নি। তবুও ভাবতে ভাল লাগে আমি অনেকের তুলনায় অনেক ভাল আছি। তাছাড়া হরিজন সমাজও পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক মানুষই আমাদের কাজকে সম্মান দিচ্ছে।'

ভাবতে ভাল লাগে সুবল চন্দ্র দাস শুধু নিজের পরিবার নিয়ে নয়, আশার আলো দেখেন সমগ্র হরিজন সমাজকে নিয়েই।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি	:	৩
নাম	:	শাহজাদী
বয়স	:	৯৫ বছর
পদবী	:	নেই
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	নেই
কর্মস্থল	:	নেই
ওজন	:	৬৭ কেজি
উচ্চতা	:	৪ ফুট ৮ ইঞ্চি

গণকটুলী হরিজন কলোনীতে বসবাসরত আমার দেখা সবচেয়ে বয়স্ক হরিজন। বয়স আর অভিজ্ঞতা মিলিয়ে হরিজনদের বহু ইতিহাসের সাক্ষী। এক সময় শাহজাদী স্বামী আর ৯ ছেলে-মেয়ে নিয়ে গণকটুলী হরিজন কলোনীতে বসবাস করতেন। ছেলে-মেয়ে সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। নাতি-নাতনীর সংখ্যা ২৭ জন। তারাও এখন বড় বড়। অনেকেই পড়াশোনা করছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত আছে।

শাহজাদীর স্বামী মারা গেছে প্রায় ২০ বছর হয়েছে। পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একসময় ছেলেরা তাকে আলাদা করে দিয়েছে। কলোনীর কাছে শাহজাদীর জন্য একটি টিনের চালা তৈরী করে দিয়েছে তারা।

শাহজাদীর মুখের ভাষা হিন্দী। বর্তমানে তার পরিবারের সদস্যরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সুইপার পদে কর্মরত আছে। কেবল শাহজাদীর হাতে কোন কাজ নেই। জীবনের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত তিনি।

আক্ষেপ করে শাহজাদী বলেন, 'বয়স হয়ে গেছে। বয়সের ভারে ঘরে কোন কাজ করতে পারি না। ছেলে-মেয়েরা আমাকে বিবেচনা করে সংসারের বাড়তি হিসেবে। ঘরে নাতি-পুতি আসল। থাকার জায়গার সঙ্কট দেখা দিল। আমাকে তারা ঘর থেকে বের করে দিল। টিনের ঝুপড়ি করে দিল কলোনীর পাশে।'

Dhaka University Institutional Repository

466285

শাহজাদীর সাথে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে তার নিজের কোন আয়-রোজগার নেই। ছেলে-মেয়েরা তার কোন খবরাখবর রাখে না। গণকটুলীতে বসবাসরত বিভিন্ন ঝাড়ুদারের বাসা থেকে শাহজাদীকে প্রতিদিন খাবার দেওয়া হয়। খাদ্য তালিকায় বেশির ভাগ সময় রুটি, সবজি, ছোট মাছ ইত্যাদি থাকে। বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস প্রতিমাসে শাহজাদীকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। সঞ্চয় বলতে শাহজাদীর কিছুই নেই।

কথা বলে জানা যায়, একসাথে না থাকলেও ছেলে-মেয়েদের সব খবরই তিনি রাখেন। তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন যেদিন তার বড় নাতিটি এস.এস.সি পাশ করেছিল। তিনি বলেন, 'সন্তানরা বেশিদূর শিক্ষিত হতে না পারলেও নাতি-নাতনীরা পড়ছে। অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীও করছে। এটি আমার জীবনের পরম পাওয়া।'

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার পরেও শাহজাদী কোনদিন ভোট প্রদান করেননি। জাতপেশা ঝাড়ুদারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাবু, জন্মের পর থেকেই বাপ-দাদাদের এই পেশায় দেখছি, স্বামীকে দেখেছি, সন্তানরাও করল, নাতি-পুতিদের অনেকেই করছে। আমরা এই পেশাকে আকড়েই বেঁচে আছি। পেশাটায় একটা মায়া পড়ে গেছে। জন্মান্তরের মায়া।'

শাহজাদীর এই কথায় ঝাড়ুদারি পেশার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা ফুটে ওঠে। জাতপেশার প্রতি এমন ভালবাসা খুব একটা দেখা যায় না।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি	:	৪
নাম	:	রাজিব রবিদাস
বয়স	:	২৪ বছর
পদবী	:	ছাত্র
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	অনার্স দ্বিতীয়বর্ষ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	:	কবি নজরুল সরকারী কলেজ
ওজন	:	৬০ কেজি
উচ্চতা	:	৫ ফুট ৫ ইঞ্চি

গণকটুলী হরিজন কলোনীর সীমানায় নির্মিত টিনের ঝুপড়ি ঘরে বসবাসরত শিক্ষিত হরিজন। বাবা মৃত। দু'টি ঝুপড়ি ঘর জোড়া দিয়ে পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসবাস করে। দাদী, মা, চাচা-চাচী, ফুপু, চাচাতো-ফুপাতো ভাই-বোন মিলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। হরিজন কলোনীর শিক্ষিত মানুষের তালিকায় রাজিব রবিদাসের নামও আসে। বর্তমানে কবি নজরুল সরকারী কলেজে সম্মান দ্বিতীয়বর্ষে অধ্যায়নরত রাজিব।

রাজিবের মা স্বামীর মৃত্যুও পর বিউটি পার্লারের কাজে যোগ দেন। কেউ চাইলে বাড়িতে এসেও কাজ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এই পেশায় নিয়োজিত।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে অনেকে জাতপেশা ঝাড়ুদারিতে থাকলেও শিশু-কিশোররা বেশিরভাগ লেখা-পড়া করছে। পরিবারের সদস্যরা সকলে মিলে যে টাকা রোজগার করে তা দিয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করা গেলেও সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই থাকে না। তাই স্বাদ-আহলাদ তাদের কাছে অনেকটাই বিলাসিতা বলে মনে হয়।

রাজিবের পরিবারের ব্যবহারের জন্য কোন নিজস্ব টয়লেট নেই। অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে তারা পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করে। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর ধরে।

রাজিবের পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন খাবার হিসেবে ভাত, সবজি, ছোট মাছ, ডাল ইত্যাদি খাওয়া হয়। মাংস খাওয়া হয় মাসে একবার অথবা দু'বার। অধিকাংশ সময় মুরগির মাংস খাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়, কদাচিৎ শূকর রান্না হয়। রন্ধন প্রণালী সাধারণ। পুরুষরা যেহেতু বাইরে কাজ করে তাই রান্নার কাজটি মহিলাদেরই সারতে হয়।

হরিজন কলোনীর ঘিঞ্জি পরিবেশের মাঝে এত ভীষণ রকম কষ্ট করে বেঁচে থাকার পরও রাজিব স্বপ্ন দেখে একদিন সে গ্রেজুয়েট হবে, বড় চাকুরী করবে, এই ঘেরাটোপ থেকে বের হবে, তারপর হরিজন সমাজের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবে।

রাজিব বলেন, 'জানি, আমার একার পক্ষে কিছু করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরেও নতুন প্রজন্মের সদস্য হিসেবে আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাব। হরিজনদের অধিকারগুলো সমাজে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।'

এই প্রত্যয় শুধুমাত্র রাজিবের একার নয়, বরং তা যেন হরিজন সমাজের প্রতিটি পড়াশোনা জানা যুবক, কিশোর ও শিশুরই আত্মপ্রত্যয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী : ৪

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

Asaduzzaman, A
2001 The Pariah People, An Ethnography of the Urban Sweepers in Bangladesh. University Press Limited.

Asad,Talal, ed.
1973 Anthropology & The colonial Encounter. USA: Humanities Press.

Arefeen, H.K.
1986 Changing agrarian Structure in Bangladesh: Shimulia, A Study of a Periurban Village. Centre for Social studies, Dhaka.

Bailey, F.G.
1957 Caste and the Economic Frontier. Manchester.

Bottomore, T.B.
1955 Classes in Modern Society. London.

Beteille, Andre
1965 Caste, Class and Power: Changing Social Stratification in a Tanjore Village. University of California Press. Berkeley.

Beteille, Andre
1972 Inequality and Social Change. Oxford University Press. Delhi.

Barnard, Alan
2000 History and Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Clifford, James and George Marcus, ed.
1986 Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley. University of California Press.

Cohn, Bernards
1955 The Changing Status of a Depressed Caste, In Mckim Marriot, ed. Village India: Studies in Little Community. University of Chicago Press. Chicago.

Chowdhury, Anwarullah
1978 A Bangladesh Village. A study of social stratification. Ananya, Dhaka.

Dumont, L
1970 Homo Hierarchicus: The Caste System and It's Implications. Weldenfeld awnd Nichol Son. London.

Durkheim, Emile
1964 The Elementary Forms of Religious Life. Allen and Unwin. London.

Ember, Carol Rand Melvin Ember
1990 Cultural Anthropology. 6th edn. New Jersey: Prentice Hall.

Foucault, Michel
1980 Power/Knowledge: Selected Interviews and other Writings. Colin Gordon ed. New York: Pantheon.

Gramsci, Antonio
1971 Selection from the Prison Notebooks. New York. International Publishers.

Dhaka University Institutional Repository

H. Russell, Bernard
1940 Research Methods in Cultural Anthroplogy. Sage Publications.

Lewis, Oscar
1958 Village Life in North India. Urbana, III.

Levi-Strauss, Claude
1969 The Elementary Structures of Kinship. London.

Karim, A. K. Nazmul
1956 Changing Society in India and Pakistan. Dhaka Ideal Publication.

Marriott, M.ckim
1951 Social Structure and changing in a U.P. Village. Economic Weekly, 4.

Spradley, P. James
1979 The Ethnographic Interview. Harcourt Brace Jovanovich Cdlex Publishers.

Spradley, P. James
1980 Participant Observation. Harcourt Brace Jovanovich Publishers.

Said, Edward W.
1978 Orientalism. New York: Pantheon.

জলদাস হরিশংকর
২০১২ রামগোলাম। প্রথমা।

Dhaka University Institutional Repository

বসু, নির্মল কুমার
১৯৪৯ হিন্দু সমাজের গড়ন। বিশ্বভারতী।
বন্দোপাধ্যায়, শেখর; দাশ গুপ্ত, অভিজিৎ
১৯৯৮ জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ। আই সি বি এম, দিল্লী।

ভট্টাচার্য, তপোধীর
১৯৯৭ মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

রায়, নীহাররঞ্জন
১৯৪৯ বাঙালীর ইতিহাস; আদিপর্ব। কলিকাতা।

আহমেদ, রেহনুমা; চৌধুরী, মানস
২০০৩ নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ; সমাজ সংস্কৃতি। একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

চৌধুরী, আহমেদ ফজলে হাসান
২০০৩ নৃবৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম; রূপান্তরের ধারা। ইনষ্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপলজী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী : ৫

প্রাপ্ত ছবি

গণকটুলী হরিজন কলোনীর প্রবেশদ্বার

গণকটুলী হরিজন কলোনী, মানুষের মুখের ভাষায় 'মেথরপট্টি'।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসেপ গণকটুলী সিটি কর্পোরেশন স্কুল

কলোনীগুলোর সীমানার ভেতরে অবস্থিত রাস্তা

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রাইভেট টয়লেট নেই, তাই পাবলিক টয়লেটেই চলে প্রতিদিনের গোসলের কাজ

এভাবেই বেড়ে ওঠে হরিজন শিশুরা

Dhaka University Institutional Repository

ঘিঞ্জি পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ এর কার্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বসতি এলাকা ও পরিবেশ

বসবাসের জন্য নির্মিত নতুন ভবনসমূহ